জলটুঙি রহস্য

রাধারমণ রায়

BanglaBook.org

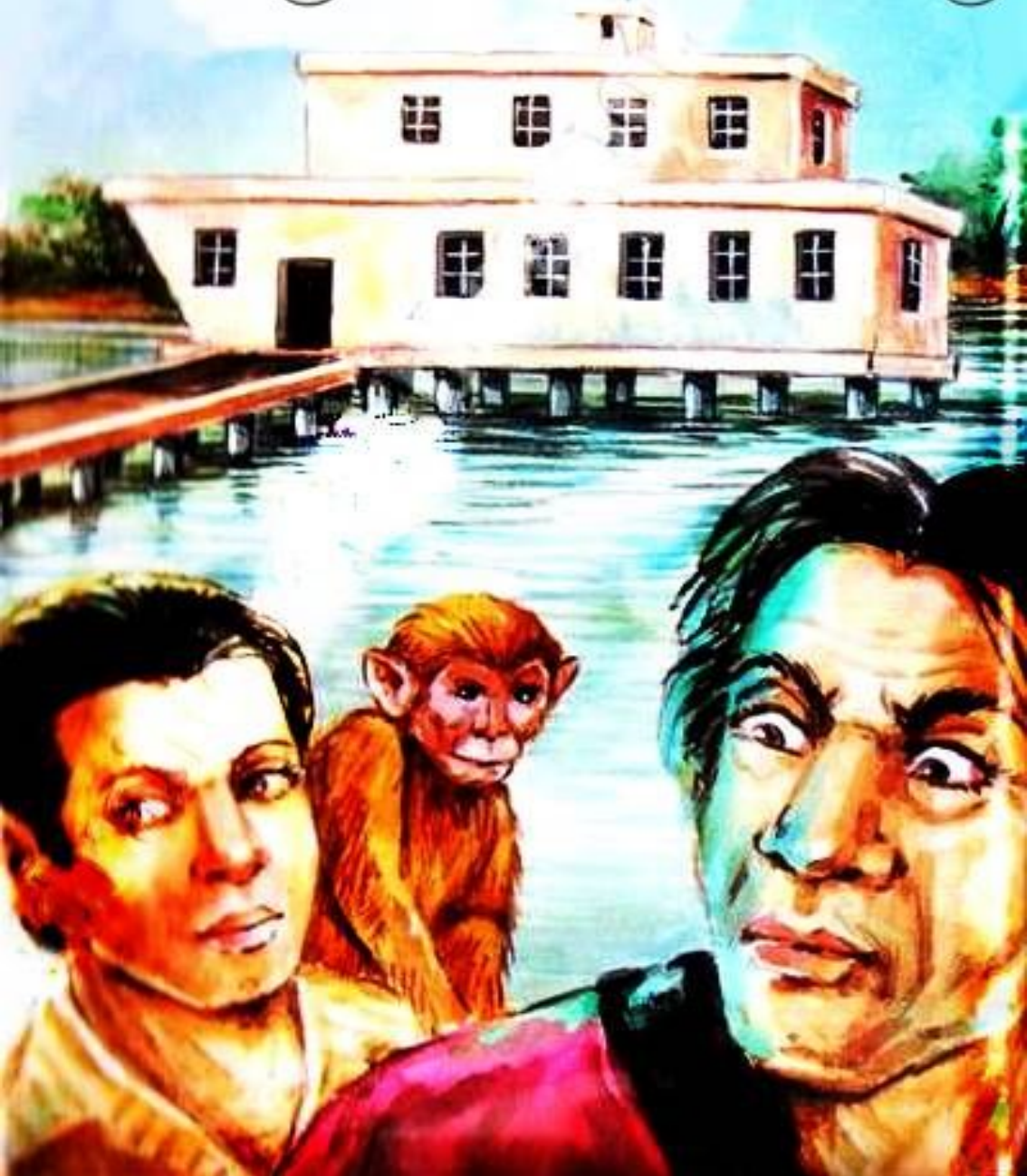

জলটুঙি রহস্য

রাধারমণ রায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

JALTUNGI RAHASYA
By *Radharaman Roy*
CODE NO. 48 J 24
Price Rs. 60.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel 2350-4294/4295/7887

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১০১, মাঘ ১৪১৭

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স
প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪
পরগনা থেকে মুদ্রিত। **বর্ণ সংস্থাপন ঃ**
প্রদ্যুৎ সাহা, ৭, কামারডাঙ্গা রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত
দাম ঃ ৬০.০০

আরাত্রিকাকে

॥ এক ॥

জলটুঙির ছবি

জলটুঙির ছবিটা আঁকার পর গোয়েন্দা গণেশ হালদার তার তলায় চার লাইনের যে হেঁয়ালি-মার্কা ছড়াটা লিখে দিল, সেটা এই ঃ

টলমল করে জল
তার মধ্যে টুঙি।
মাঝরাতে খলখল
মালে নেই চুঙি।

এরপর গণেশ হালদার ছড়াটাকে গদ্য করে ছড়িয়ে লিখল ঃ 'কোনও একটা জায়গায় একটা জলা আছে। জলা হচ্ছে জলাশয়। তার জল খুব গভীর। সেই জল হাওয়ায় টলমল করে। জলার মাঝখানে আছে একটা 'টুঙি'। সেখানে মালপত্তর বেচাকেনার জন্য মাঝরাতে কারবারীরা হাজির হয়। তারা তখন উঁচু গলায় দর কষাকষি করে; খলখল করে হাসাহাসিও করে। তারা যে-সব মাল এখানে বেচাকেনা করে, তাতে 'চুঙি' লাগে না। এই কারবারীরা সবাই খুব খারাপ লোক। চোরা-পথে বেআইনি ব্যবসা করে। তাই তাদের মালে 'চুঙি' বসানোর সুযোগ থাকে না।'

জিৎ আর বুড়ি দুজনেই ছবি-ছড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। জিতের চোখ ছবিটার ওপর। বুড়ি মন দিয়ে ছড়াটা পড়তে লাগল। তারপর ছড়ার ছড়ানো গদ্যটাও দেখে নিল।

জিৎ আর বুড়ি দুই আপন ভাই-বোন। জিতের বয়স চোদ্দ, বুড়ির বারো। জিৎ ক্লাস নাইনে পড়ে, বুড়ি ক্লাস সেভেনে। জিতের স্বভাব চাপা, কম কথা বলে। বুড়ি কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না, কথা বেশি বলে।

গণেশ হালদারের সঙ্গে জিৎ-বুড়ির রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও গণেশ হালদার ওদের কাছে আপন কাকার চাইতেও আপন। দক্ষিণ কলকাতায় সর্দার শঙ্কর রোডের ৫ নম্বর বাড়িতে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে ওরা থাকে।

জিতের বাবা প্রভাত দাস গণেশ হালদারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবে গণেশ হালদার প্রভাতবাবুর চাইতে বয়সে বছর দুয়েকের ছোটো। প্রভাতবাবু গণেশ হালদারকে নাম ধরে ডাকেন। আর গণেশ হালদার প্রভাতবাবুকে 'দাদা' বলে। এই সুবাদে ও হচ্ছে জিৎ-বুড়ির কাকু। ওর তদন্তের কাজে জিৎ-বুড়ি দুজনেই সাহায্য করে।

BanglaBook.org

অবশ্য এই কাজে গণেশ হালদারকে আরও একজন সাহায্য করে থাকে। তার নাম সুন্দর কিন্তু জাতে মর্কট, অর্থাৎ ছোটো চেহারার বাঁদর। আসলে এই বাঁদরটা হচ্ছে জিৎ-বুড়ির পোষা। ওদের খুব ন্যাওটা।

কথা হচ্ছিল গণেশ হালদারের ফ্ল্যাটে বসে। সময় তখন সকাল ৯টা।

বুড়ি গণেশ হালদারের লেখা ছড়া আর গদ্যটা পড়ার পর কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে শুধোল, 'কাকু, 'টুঙি' মানে কি জলঘর?'

গণেশ হালদার বলল, 'আসলে 'টুঙি' মানে মাচার ওপর তৈরি ছোটো ঘর। জলের মধ্যে খুঁটি বা পিলার বসিয়ে তার ওপর মাচা বা মেঝে তৈরি করে যে ঘর তোলা হয়, তার নাম জলটুঙি। ছবিতে যে-বাড়িটা দেখছ, এটা হচ্ছে সেই জাতের, তবে দোতলা বাড়ি। একে জলঘরও বলতে পারো।'

'আর 'চুঙি' জিনিসটা কী?' বুড়ি ফের শুধোল।

'মালের আমদানি-রপ্তানির ওপর যে মাসুল ধরা হয়, তাকেই বলে 'চুঙি'। 'চুঙ্গিকর' কথাটা তো খবরের কাগজে প্রায়ই ছাপা হয়। 'চুঙ্গি' আর 'চুঙি' হচ্ছে একই জিনিস।' এরপর গণেশ হালদার জিৎকে শুধোল, 'তুমি কিছু বলবে না?'

জিৎ এতক্ষণ ছবিটা দেখছিল। এখন ছড়া আর গদ্যটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সামান্য আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, 'যা বুঝেছি, বলে যাচ্ছি। চারদিকে বন আর মাঠ। তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তার পশ্চিমধারে একটা জলা। সেই জলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজের মতন দেখতে এই দোতলা বাড়িটা। সাইনবোর্ড দেখেই বোঝা যাচ্ছে বাড়িটা একটা রেস্টহাউস। এর 'জলটুঙি রেস্টহাউস' নামটা যে খুবই সার্থক, তা বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। ডাঙা থেকে বাড়িটায় যাওয়া-আসার জন্যে এর সামনে আর পেছনে রয়েছে দুটো ফ্লোটিং ব্রিজ, যার বাংলা হচ্ছে ভাসমান সেতু। ছবিটা আমার ভালো লেগেছে।'

বুড়ি বলল, 'আমারও ভালো লেগেছে।'

জিৎ বুড়ির কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল, 'এই জলটুঙিতে মাঝরাতে কুখ্যাত চোরাচালানকারীদের আনাগোনা হয়। তারা এখানে চোরাই মাল বেচাকেনা করে। চোরাপথে বিদেশ থেকে মাল এনে এখানে বিক্রি করে, কিংবা এ-দেশের মাল এখান থেকে কিনে চোরাপথে তারা বিদেশে পাচার করে। এতে সরকারকে চুঙিকর দিতে হয় না। ঠিক বলেছি তো, কাকু?'

গণেশ হালদার জিতের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিল। বলল, 'হেঁয়ালিটা যে নিষ্ফল হয়নি, তোমার ব্যাখ্যা শুনেই বুঝতে পারছি। আমি যা বলতে চেয়েছি, তোমার ব্যাখ্যায় তা সঠিকভাবেই ফুটে উঠেছে।'

বুড়ি বলল, 'আমার কাছে কিন্তু এখনো হেঁয়ালিটা পরিষ্কার হয়নি। তুমি হঠাৎ কেন জলটুঙি নিয়ে হেঁয়ালি লিখতে গেলে, সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। এ-রকম একটা অদ্ভুত বাড়ি যে কোথাও থাকতে পারে, বিশ্বাসই হয় না। আর

BanglaBook.org

চোরাচালানকারীরা তাদের কারবারের জন্যে এই বাড়িটাকেই কেন বেছে নিল, তাও বুঝতে পারছি না। দেশে পুলিশ থাকতে তারা এ-রকম বেআইনি কারবার করতে সাহস পাচ্ছে কী করে, মাথায় আসছে না। ছবির এই জায়গাটা কোথায়, কাকু?'

গণেশ হালদার বলল, 'জায়গাটা নর্থ-বেঙ্গলে। কোচবিহার জেলায়। বাংলাদেশ বর্ডার এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

বুড়ি শুধোল, 'তুমি এই ছবিটা আঁকলে কী করে? সেখানে কখনো গিয়েছিলে?'

'এখনো যাইনি, তবে যাব। ছবিটা আঁকলাম আমার এক পুলিশবন্ধুর পাঠানো চিঠি পড়ে। তিনি হচ্ছেন দিনহাটা থানার বড়বাবু। তাঁর নাম নীলাম্বর মজুমদার। জলটুঙির রহস্য ভেদ করার জন্যে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।' গণেশ হালদার বলল।

জিৎ বলল, 'তোমার বন্ধু যে-থানার বড়বাবু, জলটুঙিটা কি সেখানে?'

গণেশ হালদার বলল, 'জলটুঙির ছবি আর ছড়া যে তোমাদের মনে রীতিমতন কৌতূহল সৃষ্টি করেছে, তোমাদের প্রশ্ন শুনেই বুঝতে পারছি।' এই বলে গণেশ হালদার একটিপ নস্যি নাকের ভেতর গুঁজে দিল। তারপর বলল, 'এর অবস্থানটা খোলসা করে বলছি। দিনহাটা থানার দক্ষিণ অংশে ধরলা নদীর পুবদিকে আছে একটা জলা। সেই জলার মধ্যে জলটুঙি রেস্টহাউসটা দাঁড়িয়ে আছে। এর পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে আছে আকালপুর গ্রাম। আর পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে আছে সীমান্ত-শহর হরিহরপুর। মাঝখানে কোনো গ্রাম-গঞ্জ নেই। তবে জলটুঙির কাছেই, এর উত্তর দিকে আছে একটা আশ্রম। সেখানে একজন সাধু থাকেন। এই আশ্রমের গেটটাও বিকেল চারটের সময় বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই বুঝতে পারছ কত নির্জন পরিবেশে জলটুঙি রেস্টহাউসটার অবস্থান।'

বুড়ি বলল, 'কাকু, জলটুঙি রেস্টহাউসে কারা রেস্ট নেয়, আর একবার বলো।'

গণেশ হালদার বলল, 'স্মাগলাররা। বাংলায় এদের চোরাচালানকারী বলা হয়। নির্জন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তারা সেখানে ঘাঁটি তৈরি করেছে। অথচ প্রমাণের অভাবে পুলিশও তাদের কিছু করতে পারছে না। পুলিশের মধ্যেও তাদের ইনফর্মার থাকতে পারে। পুলিশ সেখানে হানা দেওয়ার আগেই তারা সেখান থেকে মালপত্তর সরিয়ে ফেলছে।'

গণেশ হালদারের কথা শেষ হতেই জিৎ-বুড়ির পোষা বাঁদর সুন্দর গুটি গুটি পায়ে ঘরে ঢুকেই বুড়ির কোলে লাফিয়ে উঠল। তা দেখে গণেশ হালদার মন্তব্য করল, 'মা-মণির বাঁদর-ছেলেটার নামকরণ কিন্তু খুবই সার্থক হয়েছে।'

বুড়ি অমনই রেগে গিয়ে সুন্দরকে দু'হাতে তুলে গণেশ হালদারের দিকে ছুঁড়ে

BanglaBook.org

দিল। গণেশ হালদার ওকে লুফে নিয়ে শুধোল, 'কী রে সুন্দর, কাল আমার সঙ্গে জলটুঙি দেখতে রওনা হবি তো?'

সুন্দর মানুষের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও মানুষের ভাষা বোঝে। গণেশ হালদারের প্রশ্নের জবাবে ও ঘাড় কাত করে জানাল যাবে।

এরপর গণেশ হালদার জিৎ আর বুড়ির দিকে ঘুরে বলল, 'তোমরা কী করবে?'

জিৎ বলল, 'আমিও যাব। আমার স্কুলে তো এখন পুজোর ছুটি চলছে।'

বুড়ি বলল, 'আমার স্কুলেও ছুটি চলছে। আমিও যাব।'

গণেশ হালদার হেসে বলল, 'তোমার যাওয়ার ব্যাপারে আমার একটা শর্ত আছে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি গোড়ায় যে-ছড়াটা বলেছি, তার মানেটা তুমি যদি সরল বাংলায় বলতে পারো, তবেই তুমি জলটুঙিতে যাওয়ার পরীক্ষায় পাশ করবে। ফেল করলে যাওয়া হবে না।'

বুড়ি বলল, 'ছড়ার মানেটা প্রথমে বুঝতে না পারলেও এখন পেরেছি। মানেটা হচ্ছে কোনো এক জায়গায় একটা জলা আছে। তার জল সব সময় টলমল করে। সেই জলার মধ্যে আছে একটা জলটুঙি। তার মানে জলঘর। সেখানে গভীর রাতে স্মাগলাররা জড়ো হয় চোরাই মাল বেচাকেনার জন্যে। তখন তারা চেঁচামেচি করে। কেউ কেউ খলখল করে হেসেও ওঠে। তাদের মালে চুঙিকর বসানো যায় না।'

গণেশ হালদার বলল, 'বাহ্! চমৎকার! অতএব পাশ। তোমার যাওয়া হচ্ছে।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'আসছে কাল সন্ধে ছ'টায় এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ছাড়বে। তোমরা রেডি হয়ে থাকবে। কাল বিকেল পাঁচটায় আমরা বাড়ি থেকে বেরোব। তোমাদের মাকে রাজি করানোর ভার আমি নিলাম। বউদি আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।'

জিৎ-বুড়ির বাবা কাজ করেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে। এখন তিনি কাজের সুবাদে গ্রেট নিকোবরে আছেন। কাজেই কোচবিহারে যাওয়ার ব্যাপারে ওদের মায়ের অনুমতিই যথেষ্ট। ওরা জানে, গণেশ হালদার চাইলে মায়ের অনুমতি পেতে দেরি হয় না।

বুড়ি বলল, 'তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব!'

গণেশ হালদার বলল, 'ধন্যবাদ পরে। আগে জলটুঙির রহস্যটা ভেদ করি। তবে এই কাজে তোমাদের সাহায্যও দরকার হবে।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'জলটুঙিকে জানতে হলে পিংকি-রিংকিকে জানতে হবে। ওদের মামা সুশান্ত বিশ্বাসকে জানতে হবে। আর জানতে হবে জলটুঙির মালিক বলহরি তালুকদারকে।'

বুড়ি শুধোল, 'পিংকি-রিংকি কে?'

BanglaBook.org

গণেশ হালদার বলল, 'প্রায় তোমাদেরই বয়েসি দুটো মেয়ে।'

জিৎ বলল, 'কী করে তাদের কথা জানা যাবে?'

'জানার উপায় আছে। আগেই বলেছি দিনহাটা থানার ইন-চার্জ নীলাম্বর মজুমদার আমার বন্ধু। সে আমাকে একুশ পাতার একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। অনেকটা গল্পের মতন করে। সেটা পড়লেই জলটুঙির ছবিটা তোমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে। চিঠিটা আমার টেবিলেই রয়েছে। তোমরা দুজনেই এটা পড়ে নেবে।' এই বলে পিন দিয়ে গাঁথা কয়েকটা কাগজ গণেশ হালদার জিতের হাতে তুলে দিল।

॥ দুই ॥

পিংকি আর রিংকি

পিংকি আর রিংকি দুই বোন। ওদের বাবা আছেন, মা নেই। মা মারা গিয়েছেন বছর চারেক আগে। মায়ের মৃত্যুর একবছরের মধ্যেই বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়। তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে সেই থেকে বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর ডান-অঙ্গ অবশ-অসাড়। তিনি পক্ষাঘাতে পড়ার পর থেকেই তাঁর 'চঞ্চল' নামটার সার্থকতা হারিয়ে গেল।

হ্যাঁ, পিংকি-রিংকির বাবার নাম চঞ্চল। পদবি হচ্ছে সামন্ত। ওদের বাড়ি কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা থানার নীলছবি গ্রামে। গ্রামটিকে পশ্চিমপাশে রেখে উত্তরদিক থেকে দক্ষিণদিকে বয়ে গিয়েছে জলঢাকা নদী।

নীলছবি গ্রামখানি ছবির মতন সুন্দর। চঞ্চল সামন্তের সংসারটাও ছবির মতন সুন্দর ছিল। প্রায় পঞ্চাশ বিঘে জমির মালিক ছিলেন তিনি। দু'জোড়া হাল-বলদ আর দুজন মাস-মাইনের কিষাণ ছিল তাঁর আবাদে। তা ছাড়া তিনি নিজেও চাষের কাজে হাত লাগাতেন।

বেশ চলছিল। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পর থেকে চঞ্চলের সংসারে উল্টো স্রোত বইতে শুরু করল। চাষবাসে তাঁর মন রইল না। কিষাণরা কাজে ফাঁকি দিতে লাগল। চাষে লাভের পরিবর্তে শুরু হল লোকসান। তারপর তিনি যখন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন, তখন চাষবাস উঠে গেল।

মাথাভাঙার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ যোগেশ পাল চঞ্চলের চিকিৎসা করলেন। তাঁকে সুস্থ করে তোলার অনেক চেষ্টা করলেন। কোচবিহার সদর থেকেও ডাক্তার আনা হল। এতে ফসল বিক্রির টাকা ছাড়াও কয়েক বিঘে জমি বিক্রির টাকা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু চঞ্চলের সুস্থ হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

শেষে পিংকি-রিংকির স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পিংকি তখন ফাইভে পড়ে, রিংকি থ্রিতে। কিন্তু বাড়িতে বসে বাংলা আর ইংরেজিটা ওরা শিখতে

BanglaBook.org

থাকল।

চঞ্চল নড়াচড়া করতে না পারলেও অস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলতে পারতেন। তিনি একদিন মেয়েদের কাছে ডেকে বললেন, 'আমার চিকিৎসার জন্যে আর খরচ করে লাভ নেই। আমি আর ভালো হব না। তা ছাড়া যেটুকু চাষের জমি আছে, সেটুকুও বিক্রি করা চলবে না। কেননা ওটুকুই হচ্ছে আমার শেষ সম্বল। ভেবে পাচ্ছি নে, আমাদের তিনটে পেট চলবে কী করে। তোদের লেখাপড়া তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' তাঁর কথাগুলো শেষ দিকে কান্নায় ভিজে গেল।

পিংকি-রিংকিও চোখের জল সামলাতে পারল না। শেষে অনেক কষ্টে ডানহাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে পিংকি উচ্চারণ করল, 'বাবা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমরা জমি-জায়গা নষ্ট করব না।'

বাবা বললেন, 'আমি ভাবছি আমাদের চলবে কি করে।'

'সেটাও একরকম ঠিক করে রেখেছি। কেবল তোমার অনুমতি দরকার।'

'কিসের অনুমতি?'

'আগে যে জমি বিক্রি হয়েছিল, তার কিছু টাকা এখনও আমার হাতে আছে।'

'সে টাকায় ক'দিন আর চলবে?'

'তুমি অনুমতি দিলে সেই টাকায় হাট থেকে ছাগল কিনব। গেল হাটে দর করে দেখেছি, তাতে প্রায় একশটা বাচ্চা ছাগল পাওয়া যাবে।'

চঞ্চলকে চুপ করে থাকতে দেখে পিংকি ফের বলল, 'বাবা, তুমি চুপ করে আছো কেন?'

চঞ্চল বললেন, 'সামন্তবাড়ির মেয়ে হয়ে তোরা শেষে ছাগল চরাবি?'

পিংকি বলল, 'অবস্থার ফেরে মানুষ চুরি-ডাকাতি করে। আর আমরা তো সৎপথে খেটে খাব। এ-গাঁয়ের অনেক মেয়েই তো ছাগল চরায়। বাবা, তুমি অমত করো না।'

'বেশ, যা ভালো বুঝিস কর।' বলেই চঞ্চল চোখ বুজে চোখের জল সামলানোর চেষ্টা করলেন।

রিংকি নিজের ওড়না দিয়ে বাবার চোখের জল মুছিয়ে দিল। তারপর বলল, 'তুমি কেঁদো না, বাবা। ছাগল চরাতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আমরা খুব ছুটতে পারি।'

বাবার অনুমতি পেয়ে পিংকি-রিংকি হাট থেকে সত্তরটা ছাগল আর একশটা মুরগি কিনে আনল। ধাড়ির থেকে বাচ্চার সংখ্যাই বেশি। বাড়িতে তাদের রাখার জায়গার অভাব নেই। একটা বিশাল গোয়াল-ঘর পড়ে রয়েছে; আগে সেখানে গোরু থাকত।

প্রবল উৎসাহে কাজে নেমে পড়ল পিংকি আর রিংকি। দেখতে দেখতে

BanglaBook.org

ছাগল আর মুরগির সংখ্যা বাড়তে লাগল। লাভও হতে লাগল আশাতীতভাবে। চঞ্চল সামন্তের সংসারে আবার সচ্ছলতা ফিরে এল।

তবুও মনে সুখ নেই চঞ্চলের। তাঁর মৃত্যুর পর গার্জেনবিহীন পিংকি-রিংকির ভবিষ্যৎ কী হবে, এই চিন্তায় তাঁর দু'চোখে নেমে আসে জমাটবাঁধা অন্ধকার। মাঝি ছাড়া যেমন নৌকো চলতে পারে না, তেমনই গার্জেন ছাড়াও সংসার চলে না। দুষ্টু লোকেরা সুযোগ নেয়।

এ-ভাবেই চারটে বছর কেটে গেল। পিংকির বয়েস এখন চোদ্দ। রিংকির বারো। দুজনেই দেখতে প্রায় একরকম। তবে পিংকি রিংকির চাইতে একটু লম্বা। আর রিংকি পিংকির চাইতে একটু বেশি ফরসা। দুজনেরই শরীরের গঠন সুঠাম। নাক-চোখ-মুখ তারিফ করার মতন। দুজনের চোখেই লেগে আছে বুদ্ধির ঝিলিক। সময় বিশেষে দুজনেই সমান দুঃসাহসী। গাছে ওঠায়, সাঁতার কাটায় আর ছুটোছুটি করায় দুজনেই প্রায় সমান সমান। ছাগল চরানোর সময় ছুটোছুটি ওদের করতেই হয়। ছুটোছুটি না করে ছাগল চরানো যায় না।

ছাগল চরানোর কাজে ওদের মনে কোনও খেদ নেই, বরং স্ফূর্তি আছে।

সন্ধের সময় ওরা নিজেদের চেষ্টায় বাংলা আর ইংরেজি বই জোগাড় করে বাড়িতে পড়তে থাকল। দুজনেই ইংরেজি পড়তে ভালোবাসে। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ ওরা শিখে ফেলেছে।

একদিন সাঁঝরাতে বাবা আর দুই মেয়েতে কথা হচ্ছিল। বাবার অবর্তমানে দুই মেয়ের কী হবে, তাই নিয়ে কথা।

রিংকি শুধোল, 'বাবা, আমাদের কোনও মামা-টামা নেই? অনেকেরই তো মামা আছে।'

চঞ্চল বললেন, 'তোদের মামা? হ্যাঁ, তোদের একটা মামা আছে। কিন্তু সে থাকাও যা, না থাকাও তাই।'

'কেন, বাবা?' পিংকি জানতে চাইল।

'সে তার শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে আছে। কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।' বলেই চঞ্চল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন।

রিংকি বলল, 'মামার নাম কী?'

চঞ্চল বললেন, 'সুশান্ত বিশ্বাস।'

'তাঁর শ্বশুরবাড়ি কোথায়?' পিংকির প্রশ্ন।

'তার শ্বশুরবাড়ি দিনহাটা থানায়।' চঞ্চল জানালেন।

'শহরে, না গ্রামে?' পিংকি জানতে চাইল। চঞ্চল জানালেন গ্রামে। পিংকি শুধোল, 'কোন গ্রামে?'

'গ্রামের নামটা আমার জানা নেই। শুনেছি আঁকালপুর আর হরিহরপুরের মাঝে একটা বিলের মধ্যে সুশান্তর শ্বশুরের বাড়ি। সেই বাড়িটার একটা অদ্ভুত নাম আছে।' চঞ্চল বললেন।

BanglaBook.org

'কী নাম?'

'জলটুঙি।'

রিংকি বলল, 'অদ্ভুতই তো! মামার শ্বশুরের কি চাষবাস আছে?'

'খুব সম্ভব নেই।'

'তা হলে চলে কী করে?'

'হোটেলের ব্যবসা আছে।'

'কোথায়?'

'ওই জলটুঙিতেই।' একটু থেমে চঞ্চল ফের বললেন, 'তোদের মামাও ওই জলটুঙিতে চাকরি করে। কিন্তু বিয়ের পর সে আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। তাকে অনেকবার আমাদের বাড়িতে আসতে লিখেছিলাম। প্রত্যেক চিঠির উত্তরেই সে লিখেছে, প্রচণ্ড কাজের চাপ। তাই জলটুঙি থেকে তার পক্ষে বেরোনো সম্ভব না।'

মাস দুয়েক পর চঞ্চল সামন্তের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হল। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিলেন। পিংকি আর রিংকি কাজকর্ম ফেলে রেখে তাঁর বিছানার দু'পাশে বসে রইল।

চঞ্চল দুই মেয়ের দু'খানি হাত নিজের বুকের ওপর রেখে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, 'মা পিংকি-রিংকি, আমি যে মরেও শান্তি পাব না। তোরা আমাকে কথা দে, আমি যদি মারা যাই, তোরা তোদের মামা সুশান্ত বিশ্বাসের কাছে চলে যাবি। যাওয়ার আগে তাকে চিঠি লিখবি। সে তোদের ফেলতে পারবে না। তোরা যখন খুব ছোটো ছিলি, তখন সুশান্তর বিয়ে হয়। সে কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব ভালো। খুব বাচ্চা বয়েসে তোরা তাকে দেখেছিস। তাই তার কথা তোরা মনে রাখতে পারিসনি। সে তোদের খুব ভালোবাসত। আমাকে তোরা কথা দে, আমি মারা গেলে তোরা তার কাছে চলে যাবি। যাবি তো?' তাঁর কথাগুলো জড়ানো, অস্পষ্ট। তবে বোঝা যায়।

পিংকি, রিংকি দুজনেই চুপ করে রইল। আবার কথায় কেউই সাড়া দিল না।

'কী করে, তোরা কথা বলছিস নে কেন?' বলেই চঞ্চল মেয়েদের হাতে সামান্য চাপ দিলেন।

পিংকি বলল, 'মামা যদি আমাদের সেখানে না রাখেন? তাঁর শ্বশুর যদি জলটুঙিতে আমাদের না উঠতে দেন?'

'তখন তোরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিস। কিন্তু তোরা তাকে চিঠি লেখার পর সে যদি তোদের যেতে লেখে, তোদের সেখানে যেতে হবে।'

'বেশ, তাই হবে। আমি তোমাকে কথা দিলাম।' পিংকি বলল।

চঞ্চল বললেন, 'রিংকি, তুই কী বলছিস?'

রিংকি চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি, বাবা।'

BanglaBook.org

'যাক, এবার আমি কিছুটা শান্তিতে মরতে পারব।' চঞ্চল স্বস্তিতে দু'চোখের পাতা বন্ধ করলেন; কিন্তু চোখের জল রুখতে পারলেন না। মানুষের জীবনের শেষ সময়ে এরকমই হয়।

সেই রাত্তিরেই চঞ্চল সামন্ত পিংকি-রিংকিকে অনাথ অবস্থায় রেখে মারা গেলেন। বাইরে তখন নিম্নচাপের দরুন প্রচণ্ড দুর্যোগ। ঝড় আর বৃষ্টি যেন সব লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায়।

॥ তিন ॥

জলটুঙির চিঠি

চঞ্চল সামন্ত মারা যাওয়ার দু'দিন পরে পিংকি মামার কাছে চিঠি লিখল। সেই চিঠির জবাব এল কুড়ি দিন পরে। এর মধ্যে চঞ্চল সামন্তের শ্রাদ্ধের কাজ মিটে গিয়েছে।

পিংকি-রিংকির মামা সুশান্ত বিশ্বাস নিজে কিছু লেখেননি। তাঁর হয়ে তাঁর শ্বশুর বলহরি তালুকদার লিখেছেন

খুকুমণি,

আমাকে তুমি চেনো না। তাই নিজের পরিচয়টা আগেই দিয়ে নিচ্ছি। আমি হচ্ছি তোমার মামা সুশান্তের শ্বশুর এবং জলটুঙি-রেস্টহাউসের মালিক। তুমি আর তোমার বোন রিংকি জলটুঙিতে এসে থাকতে পারো এই তিনটি শর্তে (১) জলটুঙিতে দুজনকেই নিয়মিত কাজ করতে হবে, (২) জলটুঙির বাইরে যাওয়া চলবে না, আর (৩) জলটুঙির কোনও ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করতে পারবে না। এগুলো মানতে যদি রাজি থাকো, তোমরা যে-কোনও দিন এখানে আসতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের খাওয়া-পরা-থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমাদের আসার অপেক্ষায় রইলাম।

আর একটা কথা। রেগে গেলে আমার কিন্তু 'তুই-তুমি' জ্ঞান থাকে না। স্থানীয় লোকেরা আমাকে নিয়ে নানা রকম গল্প তৈরি করেছে। তারা বলে, আমি মাতাল-মাস্তান-ডাকাত-স্মাগলার-খুনে। সবাই আমাকে ভীষণ ভয় পায়। তবে তোমরা যদি ওপরের শর্ত তিনটে মানতে রাজি থাকো, নির্ভয়ে এখানে থাকতে পারবে। মানিয়ে চলতে পারলে ভবিষ্যতে,—আমার অবর্তমানে তোমরাই হবে এই জলটুঙি-রেস্টহাউসের মালিক।

আসছ তো?

তোমাদের
দাদুভাই
বলহরি তালুকদার

BanglaBook.org

বলহরির চিঠিটা পিংকি-রিংকি দুজনেই খুব মন দিয়ে পড়ল। অনেকবার। পড়তে তো হবেই। এ তো আর দু'চার দিনের শখের অ্যাডভেঞ্চার নয়। বরাবরের ব্যাপার। বাবার শেষ ইচ্ছা এর সঙ্গে জড়িয়ে না থাকলে ওরা হয় তো এরকম শর্ত মেনে জলটুঙিতে যেতেই চাইত না। কাজকে ওরা ভয় পায় না। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কাজ তো ওদের করতেই হয়। তাছাড়া না খেটে ওরা খেতেও চায় না।

কিন্তু একটা কথা, বাবা-মা না থাকলেও এই নীলছবি গাঁয়ের ওপর ওদের আকর্ষণ একটুও কমেনি। জলঢাকা নদী, সেই নদীর ধারে কুলকুলির মাঠ যেখানে এখন ওরা ছাগল চরায়, মাঠের লাগোয়া চাষের খেত যেখানে ফলে চোখ জুড়োনো ফসল, আর ওদের গাঁয়ের মানুষজন, যারা ওদের বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, এসব ছেড়ে ওদের মন চাইছে না জলটুঙিতে যেতে। বিশেষ করে যারা ওদের খেলার সঙ্গী, সমবয়সী বন্ধু যারা, তাদের ছেড়ে যাওয়াটা খুবই কষ্টকর। মানুষের ভালোবাসার চাইতে দামি জিনিস এই জগতে আর কিছু থাকতে পারে না বলেই ওদের বিশ্বাস।

তবুও ওদের যেতে হবে। কেননা, বাবাকে ওরা কথা দিয়েছে। ওরা জলটুঙিতে না গেলে বাবার শেষ ইচ্ছা পূরণ হবে না।

পিংকি জলটুঙির মালিক বলহরি তালুকদারকে লিখে দিল ওরা সেপ্টেম্বর মাসের ২০ তারিখে রওনা হচ্ছে।

ছাগল-মুরগি ওরা বিক্রি করে দিল। বাড়ি-ঘর আর জমি-জায়গা দেখাশুনো করার ভার দিল জবার বাবার ওপর। জবা পিংকির বন্ধু আর ওদের বাড়ির সবাই পিংকিদের একান্ত আপনজন।

রওনা হওয়ার আগের দিন দুপুরে একটা ঘটনা ঘটল। পিংকি আর রিংকি জিনিসপত্তর গোছগাছ করছিল। এমন সময় জানলা দিয়ে একটা ছোট্ট ঢিল এসে পিংকির কাঁধে লাগল। পিংকি বাইরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল একটা টাকমাথা লোমশ-কান লোক নদীর দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। ওরা দু'বোনে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে তাড়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না। লোকটা নদী পার হয়ে ওপারে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা বাড়িতে ফিরে এসে লক্ষ করল লোমশ-কান লোকটা যে ছোট্ট ঢিলটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়েছিল, তাতে রবারব্যান্ড দিয়ে জড়ানো রয়েছে একটুকরো কাগজ। রিংকি কাগজটা খুলে নিয়ে পিংকিকে দিল।

কাগজটায় লেখা রয়েছে 'সাবধান! যদি বাঁচতে চাও, জলটুঙিতে এসো না। বলহরি তালুকদার খুবই ভয়ংকর লোক। জলটুঙিতে এলে তোমাদের মরতে হবে।' এরপর স্বাক্ষরের জায়গায় আঁকা রয়েছে একটা ত্রিশূল।

না, 'ত্রিশূলে'র হাতের লেখার সঙ্গে বলহরির হাতের লেখার মিল নেই।

BanglaBook.org

এরপর স্বাক্ষরের জায়গায় আঁকা রয়েছে একটা ত্রিশুল।

দুজনের লেখা দু'রকম। চিঠি দুটো পাশাপাশি রেখে পিংকি-রিংকি খুঁটিয়ে দেখল। হাতের লেখা দেখে ওরা সিদ্ধান্তে এল 'ত্রিশূল' আর বলহরি এক লোক নয় এবং বলহরি চাইলেও 'ত্রিশূল' চায় না পিংকি-রিংকি জলটুঙিতে যাক।

রিংকি তখন পিংকিকে শুধোল, 'এই 'ত্রিশূল' লোকটা কে?'

পিংকি গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'জানি না। তবে 'ত্রিশূলে'র হুমকিতে আমরা পিছোব না। জলটুঙিতে যাবই। সেখানে গেলেই জানতে পারব এই 'ত্রিশূল' লোকটা কে, আর এরকম হুমকি দিয়ে তার চিঠি লেখার উদ্দেশ্যটাই বা কী।'

॥ চার ॥

জলটুঙির বিভীষিকা

সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে পিংকি-রিংকি জলটুঙি রওনা হল। সময় তখন সকাল ৭টা। মাথাভাঙা শহর থেকে কোচবিহার যাওয়ার বাস ছাড়বে সকাল ৮টায়।

জামা-কাপড়-গামছা আর টুকটাক জিনিসপত্তর দুটো ব্যাগে ভর্তি করে যে-যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে ওরা পায়ে হেঁটে নীলছবি গ্রাম থেকে এগিয়ে চলল মাথাভাঙা শহরের দিকে। জলঢাকা নদীর ধার দিয়ে পথ। ওদের তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। ছোটোবেলার স্মৃতি-জড়ানো বাপ-মায়ের ভিটে ছেড়ে কেউই খুশি মনে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে চায় না। পথ চলার সময় ওদের পা ভারী হয়ে আসছে। চোখ ছলছল করছে। তবুও ওদের যেতে হচ্ছে।

অবশেষে ওরা মাথাভাঙার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছাল। কোচবিহার যাওয়ার বাসে কয়েকটা সিট তখনও খালি ছিল। ওরা দু'বোন পাশাপাশি দুটো খালি সিটে বসে পড়ল। দেখতে দেখতে বাকি সিটগুলোও ভর্তি হয়ে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ-সাত মিনিট পরে বাসটা ছেড়ে দিল। রিংকি জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। আর পিংকি দেখতে লাগল বাসের যাত্রীদের। না, একটাও চেনা মুখ ওর চোখে পড়ল না।

এরপর পিংকির চোখ পড়ল সামনের গেটের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ওপর। সেখানে লাল রঙের গেঞ্জি আর ছাই রঙের জিনস পরা একটা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে রয়েছে।

লোকটার বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। তার চোখের মণি দুটো অদ্ভুত। গুবরেপোকার পিঠের মতন। মাঝে মাঝেই সে পিংকি-রিংকির দিকে তাকাচ্ছে। একবার তো পিংকির সঙ্গে তার চোখাচোখিও হয়ে গেল। লোকটা তখন দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিল। পিংকি লক্ষ করল লোকটার চোখে একবারও পলক

BanglaBook.org

পড়ছে না। তার চাউনিটা পিংকির ভালো লাগল না।

পিংকি এবার বাসের বাইরে থেকে ভেতরে দৃষ্টি ফেরাল। বোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শুধোল, 'কী রে রিংকি, খুব মন খারাপ লাগছে?'

'তোমার বুঝি লাগছে না?' রিংকি পাল্টা প্রশ্ন করল।

'খারাপ তো লাগবেই। নিজের দেশ-গ্রাম বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে কার না মন খারাপ লাগে?'

'আমার কিন্তু বেশি মন খারাপ লাগছে না। যেখানে বাবা নেই, মা নেই, কিন্তু আগে ছিল, সেখানে থাকতে আমার ভালো লাগে না। ভীষণ কষ্ট হয়।'

'কষ্ট কী আমারও কম হয় রে? কিন্তু বাপ-মা তো চিরকাল কারোর বেঁচে থাকে না। যাক গে, খিদে পেয়েছে? মুড়ি খাবি?'

'পরে খাব।'

'তা হলে একটু আমসত্ত্ব মুখে দে।' এই বলে পিংকি ব্যাগ থেকে খানিকটা আমসত্ত্ব বের করে দু'টুকরো করল। এক টুকরো বোনকে দিয়ে বাকি টুকরোটা নিজে মুখে দিল।

বাসটা কোচবিহার পৌঁছোল নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। পথে এক জায়গায় বাসটা প্রায় এক ঘণ্টা দেরি করে। পেছনের একটা চাকার টায়ার পাংচার হয়ে যায়। সেটা পালটাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় খরচা হয়ে গেল। আর একটা জায়গায় একটা খুচরো ঝামেলা বেধেছিল। দুর্গাপুজোর চাঁদা আদায়ের জন্য চাঁদপুর গাঁয়ের ছেলেরা পথে অবরোধ তৈরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত ড্রাইভারের সঙ্গে দশ টাকায় রফা হল। যাত্রীদের কিছু দিতে হল না।

কোচবিহার থেকে দিনহাটায় যাওয়ার জন্য আলাদা বাস ধরতে হয়। বাস ছাড়বে বিকেল চারটেয়। পিংকি-রিংকি যে বাসে মাথাভাঙা থেকে কোচবিহার এল, সেই বাসে তিনজন দিনহাটার যাত্রী ছিল। কোচবিহারে বাস থেকে নামার পরেই তাদের সঙ্গে ওদের আলাপ হল। তাদের সঙ্গেই ওরা বাসস্ট্যান্ডের কাছেই একটা হোটেলে ভাত খেল।

তিনজন যাত্রীর মধ্যে একজন বৃদ্ধা আর তাঁর কুড়ি-বাইশ বছরের দুই ছেলে। বড়োটির নাম নিমাই, ছোটোটির নাম নিতাই। নিমাই-নিতাই দুজনেই দিনহাটায় চাকরি করে। নিমাই বি.ডি.ও. অফিসে চাকরি করে। নিতাই আছে স্টেট ব্যাঙ্কে। দিনহাটাতেই ওরা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। ওদের আদি বাস মাথাভাঙা শহরের কাছেই, ভদ্রপুর গ্রামে। ওরা বিধবা মাকে নিয়ে যাচ্ছে দিনহাটার বাসায়।

দিনহাটার বাস ছাড়ার আগেই আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। রেডিওর খবর বঙ্গোপসাগরে ভয়াবহ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার বেগে ছুটে আসছে ঝড়ো হাওয়া। সেই সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গ-উত্তরবঙ্গ কোনও বঙ্গই রেহাই পাবে না এর হাত থেকে। খবরটা পিংকি-রিংকি

BanglaBook.org

আগে জানতে পারেনি।

বাসে নিমাই-নিতাইদের কাছেই পিংকি-রিংকি সিট পেল। বাসে বসে জলটুঙির কয়েকটি বিশেষ খবর নিমাই-নিতাইয়ের কাছ থেকে ওরা জেনে গেল।

নিমাই বলল, 'দিনহাটার কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে আকালপুর গ্রাম। তার পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে ধরলা নদীর পুবদিকে জলটুঙির অবস্থান। সেখান থেকে আরও পাঁচ কিলোমিটার গেলে হরিহরপুরে পৌঁছানো যায়। তার দক্ষিণে বাংলাদেশ বর্ডার।' একটু থেমে নিমাই ফের বলল, 'মুশকিল হচ্ছে দিনহাটা শহরের ওপারে বাস যাচ্ছে না। শুনেছি পুজোর সময় দিনহাটা থেকে আকালপুর হয়ে হরিহরপুর পর্যন্ত বাস-সার্ভিস চালু হবে।'

পিংকি বলল, 'ওদিকের লোকে তা হলে যাতায়াত করে কী ভাবে?'

নিমাই বলল, 'রিকশায় কিংবা ভ্যান-রিকশায়। অটো-রিকশাও আছে। আগে গোরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িও ছিল। পিচ-বাঁধানো রাস্তা হওয়ার পর রিকশা আর ভ্যান-রিকশার দাপটে সে-সব উঠে গিয়েছে।'

পথে বিপত্তির শেষ নেই। বাসে টিকিট কাটা নিয়ে একদল তরুণ যাত্রীর সঙ্গে কন্ডাকটরের বাধল তুমুল ঝগড়া। তরুণরা দলে ছিল এগারো জন। তারা একটা কম টিকিট কেটেছিল। তরুণদের দাবি, তারা দলে আছে দশজন। দশজনেরই টিকিট কেটেছে তারা। এগারো নম্বর ছেলেটা, যে পালিয়ে গেল বাস থেকে নেমে, সে তাদের দলের নয়। শেষ পর্যন্ত তরুণদের দাবিই মেনে নিলেন কন্ডাকটর। তবে এজন্য সময় নষ্ট হল প্রায় পনেরো মিনিট।

এরপর আর এক বিপত্তি। একটা জায়গায় অবরোধ চলছিল। পথ-দুর্ঘটনায় স্থানীয় মোড়লের একটা দুঃসাহসী পাঁঠার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর লোকজনেরা পথ অবরোধ শুরু করে। পাঁঠাটার মৃত্যু হয়েছে একটা চলন্ত ট্রাকের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। এর স্বভাব ছিল কাউকে চলতে দেখলেই ছুটে গিয়ে তাকে ঢুঁ মারা। গ্রামের লোকেরা তার ঢুঁ খেয়ে এতই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে মনে মনে তারা রোজই পাঁঠাটাকে মা কালীর থানে বলি দিয়ে তার মাংসকে চড়ুইভাতির উপকরণ করার প্রতিজ্ঞা করত; কিন্তু মোড়লের ভয়ে তাদের প্রতিজ্ঞা পালন হত না। কাজেই আজকের এই অবরোধে তাদের সায় ছিল না।

শেষ পর্যন্ত অবরোধ উঠল যে দশজন তরুণের সঙ্গে টিকিট কাটা নিয়ে বাসের কন্ডাকটরের বচসা হয়েছিল, তারা রুখে দাঁড়ানোয়। অবরোধকারীরা তাদের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে সরে পড়তেই বাসটা ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে থাকা অন্য গাড়িগুলোও চলতে শুরু করল।

এই সময়েই শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। ঘড়ির হিসেবে সূর্য ডুবতে যদিও তখনও ঘণ্টাখানেক বাকি, চারদিকে রাত্রির ছায়া নেমে এল।

বিপদের ওপর বিপদ। সম্ভবত এ-লাইনে বাসের সংখ্যা খুব কম বলেই বাসে

BanglaBook.org

প্রচণ্ড ভিড় হয়। ছাদের ওপর লোক বসে। পেছনের সিঁড়িতে আর গেটে হ্যান্ডেল ধরেও ঝুলতে থাকে নিরুপায় যাত্রীরা। লাল গেঞ্জি আর ছাইরঙের জিনস পরা লোকটা, যার চোখের মণি দুটো গুবরেপোকার পিঠের মতন ড্যাবা ড্যাবা, যাকে মাথাভাঙা থেকে কোচবিহার আসার সময় দেখা গিয়েছিল, এখন পিংকি তাকে পেছনের গেটে হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে দেখল। লোকটার বিশ্রী চোখ দুটো দেখলেই পিংকির ভয় লাগে। তবে যে লোকটা ওদের নীলছবি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে 'ত্রিশূলে'র লেখা চিঠিটা ফেলে দিয়ে এসেছিল, সে-লোক আর এ-লোক এক নয়। তার কান দুটো ছিল বড়ো বড়ো লোমে ভর্তি আর মাথায় ছিল চকচকে টাক। সে লোকটাকে অবিশ্যি পথে ওরা দেখতে পায়নি।

দিনহাটায় বাসটা এসে পৌঁছোল নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। এখন রাত প্রায় আটটা। ঝড়বৃষ্টির দাপট একটু বেড়েছে। তার ওপর চলছে লোডশেডিং। কেবল ফল্টও হতে পারে। দোকান-বাজার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম।

বাস থেকে নামতে নামতে নিমাই বলল, 'এই অবস্থায় তোমরা এখন জলটুঙিতে যাবে কী করে?'

নিমাইয়ের মা বললেন, 'আজ তোমাদের সেখানে যাওয়া হবে না। আমাদের বাসায় রাতটুকু কাটিয়ে কাল সকালে যেয়ো।'

পিংকি বলল, 'তা হয় না, মাসিমা। আমি দাদুকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি আজই সেখানে যাব।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'আমাদের যেতেই হবে।'

নিতাই বলল, 'যেতেই যদি হয়, দেরি করো না। অটো ধরার চেষ্টা করো। তবে এই দুর্যোগে কোনো অটো-ড্রাইভার জলটুঙিতে যেতে চাইবে কি না বলা মুশকিল। অটো না পেলে রিকশায় যেতে হবে। চলো, তোমাদের তুলে দিয়ে আসি।'

নিমাই-নিতাই মাকে একটা খাবারের দোকানে বসিয়ে রেখে পিংকি-রিংকিকে নিয়ে অটো-স্ট্যান্ডে চলে এল। কিন্তু কোনও অটো-ড্রাইভারই জলটুঙিতে যেতে চাইল না। রিকশাওয়ালারাও সেখানে যেতে চায় না।

অনেক চেষ্টার পর একজন রিকশাওয়ালাকে রাজি করানো গেল। সেও হয়তো যেত না। তার বাড়ি যেহেতু আকালপুর গ্রামে, অর্থাৎ ওই জলটুঙির দিকেই, সেহেতু সে রাজি হল। তবে আট টাকার জায়গায় দশ টাকা ভাড়া নেবে বলল।

রিকশাটা ছাড়ার সময় নিমাই বলল, 'যদি কোনো ঝামেলায় পড়ো, দিনহাটায় ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে উঠবে। পোস্ট অফিসের উল্টোদিকের একতলা বাড়িটায় আমরা থাকি। মনে থাকবে তো?'

নিতাই বলল, 'বিপদ দেখলে এই রিকশাতেই তোমরা ফিরে এসো। ফিরে আসার ভাড়া আমরা দিয়ে দেব।' এরপর ও রিকশাওয়ালার দিকে ঘুরে বলল,

BanglaBook.org

'ভাই, এরা কিন্তু এদিকে নতুন। পথঘাট চেনে না। তোমার হাতে এদের ছেড়ে দিচ্ছি। এদের মরা-বাঁচা তোমার ওপর কিছুটা নির্ভর করছে। যদি এমন-তেমন দেখো, এদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। পোস্ট অফিসের উল্টোদিকের বাড়িতে নিমাই-নিতাইয়ের খোঁজ করলেই আমাদের পেয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'আমি আপনাদের চিনি। কথা দিচ্ছি, পথে কোনো বিপদ হলে জান দিয়ে তা রোখার চেষ্টা করব। কিন্তু জলটুঙিতে কিছু ঘটলে তো আমি নিরুপায়। আমি জলটুঙির গেটে এনাদের নামিয়ে দিয়েই ফিরে আসব।'

নিতাই পিংকির মুখের দিকে তাকিয়ে শুধোল, 'কী করবে? যাবে তো?'

পিংকি বলল, 'যাব তো বটেই।'

নিমাই বলল, 'তুমি চাইলে আমাদের দু'ভাইয়ের একজন তোমাদের সঙ্গে যেতে পারি।'

'দরকার হবে না। যদি বিপদ দেখি, আমরাই আপনাদের কাছে চলে আসব। তা হলে আসি এখন?' বলেই পিংকি রিকশাওয়ালার দিকে তাকাল। রিকশাওয়ালা রিকশাটা ছেড়ে দিল।

ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা চলছেই। তার ওপর চোখ অন্ধ করা অন্ধকার। অচেনা রাস্তা। অচেনা পরিবেশ। কাজেই রিকশাওয়ালার ওপর তাদের নির্ভর করে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

রিকশাওয়ালাকে পিংকি শুধোল, 'দাদা, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম কিংশুক। ডাকনাম কিং।' রিকশাওয়ালা বলল।

রিংকি বলল, 'বাহ্, বেশ নাম তো! তোমাকে আমি কিংদা বলব।'

পিংকি বলল, 'আমিও তোমাকে কিংদা বলব।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'আমার নাম পিংকি আর আমার বোনের নাম রিংকি। তুমি তো আকালপুরে থাকো। আর আমরা জলটুঙিতে থাকব। আজ থেকে আমরা তোমার বোন, আর তুমি আমাদের দাদা।'

কিংশুক অবাক হয়ে বলল, 'তোমরা আমাকে দাদা বললে?' এরপর ও ফের বলল, 'ঠিক হ্যায়, আমি তোমাদের দাদা। আমার নিজের কোনো ভাই-বোন নেই। কেউ আমাকে দাদা বলে ডাকে না। তা ছাড়া আমার আগের পরিচয় তোমরা যদি জানতে, তা হলে আমাকে দাদা বলা দূরে থাক, ভয়ে তোমরা আমার কাছে আসতে না।'

'কেন? তুমি তখন বাঘ ছিলে, না গণ্ডার ছিলে?' রিংকি জানতে চাইল।

কিংশুক বলল, 'আমি ছিলাম সিংহ। পশুদের রাজা। কেউ যদি আমার চোখের সামনে বাঁদরামি করত, আমি তার ঘাড় মটকে দিতাম। পুলিশ পর্যন্ত আমাকে ভয় পেত। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন নিমাই-নিতাই, যারা তোমাকে আমার রিকশায় তুলে দিল, দিনহাটায় আসেনি। তখন আমি ছিলাম এ-অঞ্চলের কিং অব

BanglaBook.org

দি মাস্তানস। মাস্তানদের রাজা।'

পিংকি বলল, 'মাস্তানি ছেড়ে দিলে কেন?'

'সে অনেক কথা। একনম্বর, বাঁদররা একজোট হয়ে আমার পেছনে লাগল। দুনম্বর, পুলিশ আমাকে ফল্‌স্‌ কেস-এ জড়িয়ে দিল। এ সময় আমার বাবাও মারা গেলেন। কেস লড়তে গিয়ে আমার জমি-জায়গা বিক্রি হয়ে গেল। তখন বাধ্য হয়ে আমি পুলিশকে কথা দিলাম, কেউ আমার পেছনে না লাগলে আমিও তাকে কিছু বলব না। সেই থেকে আমি রিকশা চালাই।' এ পর্যন্ত বলে কিংশুক একটু থামল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'চোখের সামনে অনেক অন্যায় দেখেও চুপ করে রয়েছি। জলটুঙিতে অনেক বে-আইনি কারবার চলে বলে শুনেছি। দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে সেখানে। কিন্তু কেউ কোনো প্রমাণ পায়নি। শুনেছি দিনহাটা থানার বড়বাবু, যিনি নতুন এসেছেন, চক্রটা ভাঙার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

রিকশাটা আকালপুর ছাড়িয়ে জলটুঙির সামনে এসে যখন দাঁড়াল, তখন ঝড়বৃষ্টির তড়পানি আরও বেড়েছে। চারদিকে পিচের মতন কালো অন্ধকার। শুধু জলটুঙির একতলায় আলো জ্বলছে।

কিংশুক বলল, 'আমি এখানে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকব। তোমরা গেট পার হয়ে ভেতরে যাও। গেটটা দেখছি খোলা রয়েছে। গেট পেরোলে ব্রিজ। তারপর বাড়ি। বাড়িটার সদর দরজা ব্রিজের সঙ্গে লাগোয়া। তাতে নক করবে। যদি বিপদ দেখো, চিৎকার করবে। আমি এখানে আধঘণ্টা আছি।'

পিংকি আর রিংকি রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কিংশুকের কথা মতন গেট দিয়ে ঢুকে একটা ভাসমান সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে মূল বিল্ডিং-এর সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সেই দরজার কড়ায় নাড়া দিল। ভেতরের ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে দশটা বাজল। এদিকে বাইরে চলছে চরম দুর্যোগ। পিংকি-রিংকি ভিজে চুপসে গিয়েছে। শীতে এবং কিছুটা ভয়ে কাঁপছে ওরা।

দরজাটা খুলতে খুলতে কেউ একজন ভীষণ চড়া গলায় হেঁকে উঠল, 'কে?' তারপর দরজা খুলে পিংকি-রিংকিকে দেখতে পেয়েই হেসে উঠল হাঃ-হাঃ অট্টহাসি। লোকটার চেহারাটা তার হাসির মতনই ভয়ংকর। হাসি শেষ করে লোকটা উচ্চারণ করল, 'তোমরা!' তারপর ফের বলল, 'আমি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। সঙ্গে কেউ আছে? এখানে এলে কিসে?'

লোকটাকে দেখেই পিংকি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোচ্ছে না। রিংকির অবস্থা আরও খারাপ।

'কথা বলছিস নে কেন? তোরা বোবা নাকি?' লোকটা রেগে গিয়ে আরও গলা চড়াল।

'আমরা রিকশায় এসেছি। সঙ্গে কেউ নেই।' ঢোক গিলতে গিলতে কোনও

BanglaBook.org

রকমে উচ্চারণ করল পিংকি।

'তা হলে স্বাগতম্, পিংকি-রিংকি। ওয়েলকাম টু জলটুঙি। আমার নাম বলহরি তালুকদার। লোকে বলে জলটুঙির বিভীষিকা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!' হাসতে হাসতেই প্রকাণ্ড লোকটা পিংকি-রিংকিকে ভেতরে টেনে নিয়ে দরজাটা অহেতুক জোরে বন্ধ করে দিল।

॥ পাঁচ ॥

জলটুঙির দুশমন

পিংকি-রিংকির মামার নাম সুশান্ত বিশ্বাস। নামের সঙ্গে ব্যক্তির এ-রকম আশ্চর্য মিল পিংকিরা কোথাও দেখেনি। আশ্চর্য রকমের ভালোমানুষ এই মামাটি। তবে প্রথম দিন জলটুঙিতে আসার পর মামার ব্যবহারে ওরা ধাঁধায় পড়েছিল।

বলহরি তালুকদার যখন সেই দুর্যোগের রাতে একটা বিকট হাসি হেসে পিংকি-রিংকিকে জলটুঙির ভেতরে ডেকে নিয়েছিলেন, সুশান্ত বিশ্বাস তখন একতলার রেস্তোরাঁতেই পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বলহরি সুশান্তকে বলেছিলেন, 'এই নাও তোমার ভাগনীদের। কিন্তু এরা যদি কখনো জলটুঙির শর্ত ভাঙে, আমি তোমাকে বলে রাখছি, এদের দুজনকেই আমি খুন করব। তোমাকেও রেহাই দেব না। আমার মেয়ে যেদিন মারা গিয়েছে, সেদিনই ধরে নিয়েছি, আমার জামাইও মারা গিয়েছে। যার সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, সে-ই যখন নেই, তখন তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? কাজেই খুব সাবধান! এদের কাজকর্মের জন্যে তোমাকেই দায়ী থাকতে হবে। নাও, এখন এদের খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো গে। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা তো খালি পড়ে রয়েছে। ওটাতেই এরা থাকবে। আর তুমি উত্তর-পশ্চিম কোনার যে-ঘরটায় এখন আছো, সেটাতেই থাকবে। খাওয়া-দাওয়ার পর কেউ নীচে নামবে না। নামলেই কচুকাটা করব। আমার নাম বলহরি তালুকদার। আমার নাম শুনলে ভয় পায় না এমন মানুষ এ-তল্লাটে নেই।' এই বলে তিনি রেস্তোরাঁর পেছনে একটা ঘরের দিকে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে সেটার মধ্যে ঢুকেই দরোজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

পিংকি-রিংকিকে নিয়ে দোতলায় উঠে সুশান্ত ওদের বলেছিলেন, 'তোরা এখানে কেন এলি? আমি তো তোদের আসতে লিখিনি।'

রিংকি বলেছিল, 'কেন মামা, আমরা আসাতে তোমার অসুবিধে হল?'

'অসুবিধে আমার হয়নি। অসুবিধে হল তোদের। এখান থেকে তোরা কোনো দিন বেরোতে পারবি নে, যেমন আমি পারি নে। যাক গে, যা হবার হয়েছে। শুধু একটা কথা মনে রাখবি, আমার শ্বশুরের মুখের ওপর কখনো ভুলেও কথা বলবি নে। সে যা বলবে, শুধু শুনে যাবি। প্রতিবাদ করলেই বিপদে পড়বি। আরেকটা

BanglaBook.org

কথা, এই জলটুঙির কোনো ব্যাপারে কখনো কৌতূহল দেখাবি নে। মনে থাকবে তো?' এই বলে সুশান্ত ওদের নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকের ঘরটায়, যেটায় ওদের থাকার জন্য বলহরি তালুকদার বলে দিয়েছিলেন। ঘরটা বড়ো।

সে-রাত্তিরে পিংকি-রিংকি ঘুমোতে পারেনি।

জলটুঙি-বাড়িটা দোতলা। দেখতে জাহাজের মতন। চারদিকে জল। পিংকি-রিংকি দেখে নিয়েছে, সামনের দিকে ডাঙার সঙ্গে মূল বাড়িটার যোগ সৃষ্টি করেছে একটা ভেসে থাকা সেতু। একটা জলার মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়িটার চারদিকের পরিবেশ নিঝুম। জলার জলে হাঁস বা হাঁস জাতীয় কোনো পাখির দেখা মেলে না। জলাটার সব ধারে বন-বাদাড়, ফাঁক মাঠ। সামনের দিকটায় রাস্তা থাকলেও তার ওপার থেকেই শুরু হয়েছে আগাছা আর কাঁটাঝোপে ভর্তি একটা বড়ো মাঠ। সেখানে লাঙল পড়ে না, ফসলও হয় না। জলটুঙির দুশমনের ভয়ে রাখালরা সেখানে গোরু পর্যন্ত চরায় না।

বাড়িটার একতলার সামনের অংশে রেস্তোরাঁ আর রান্নাঘর। পেছনের অংশে আছে আরও চারখানা ঘর। দোতলাতেও একতলার সমানসংখ্যক ঘর আছে। তবে দোতলার তিনখানা ঘর কেবল খোলা। বাকি তিনটে বন্ধ। এখানে দুটো বেডরুমের একটায় থাকে পিংকি-রিংকি, অন্যটায় থাকেন ওদের মামা সুশান্ত বিশ্বাস। আর একটা ঘরে খাওয়া-দাওয়া হয়। তবে বলহরি তালুকদার এ-ঘরে কখনও খান না, কেননা তিনি দোতলায় ওঠেন না।

পিংকি-রিংকির মামা সুশান্ত বিশ্বাস রান্না করেন। ওঁর শ্বশুর বলহরি তালুকদার ক্যাশে বসেন। পিংকি-রিংকির কাজ হচ্ছে খদ্দেরদের খাবার-দাবার পরিবেশন করা আর টেবিলগুলো সাফসোফ করা। নীচের ঘরগুলো পরিষ্কার করেন ওদের মামা। ঘরগুলো বলতে কেবল রান্নাঘর আর রেস্তোরাঁ। বাকি ঘরগুলোয় ঢোকা বারণ।

দোতলায় পিংকিরা কেবল নিজেদের ঘরটাই পরিষ্কার করে। মামার ঘরটাও ওরা পরিষ্কার করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি রাজি হননি। দোতলার করিডোর আর রান্নাঘরটাও তিনি পরিষ্কার করেন। তিনি ওদের বারবার বলে দিয়েছেন, দোতলার বন্ধ ঘরগুলোয় ওরা যেন ভুলেও উঁকি-ঝুঁকি মারে। জলটুঙির কোনো ব্যাপারে কোনো রকম কৌতূহল দেখানো চলবে না। তিনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন জলটুঙিতে কৌতূহল মানে মৃত্যু।

পিংকি-রিংকিরা জলটুঙিতে এসেছিল ২০ সেপ্টেম্বর। পরদিনটা ছিল ২১ সেপ্টেম্বর। এদিন সকালে জলটুঙির চারধারের দৃশ্য, যাকে ভালো বাংলায় বলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তা দেখে ওদের খুব ভালো লেগেছিল। সারা রাত দুর্যোগ চলার পর এদিন ভোরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

পিংকিরা এদিন ওদের ঘরে বসেই জানলা দিয়ে শরতের সূর্যকে পুব-দিগন্তে বন ফুঁড়ে মাথা তুলতে দেখল। ওদিকটায় রয়েছে সবুজের রাজ্য। সবুজের ওপর

BanglaBook.org

প্রথম রোদের ছোঁয়া লাগতেই প্রকৃতির রূপে চমক এল। দৃশ্য দেখে ওদের দুজনেরই মন খুশিতে টলমলিয়ে উঠল। ওরা ভুলে গলে ওদের দুঃখের কথা, জলটুঙির অজানা বিপদের কথা, আর সেই 'ত্রিশূলে'র চিঠির কথা, যাতে ওদের এখানে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল।

২১ সেপ্টেম্বর দিনটা মোটের ওপর ভালোই কাটল। বলহরি একবারও ওপরে ওঠেননি। তা ছাড়া রেস্তোরাঁতেও পিংকি-রিংকি তাঁর দেখা পেল না। রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিল সকাল ৮টায়। বন্ধ হল বিকেল ৫টায়। এই ৯ ঘণ্টায় খদ্দের এসেছে মোটে বাইশ জন।

ধরতে গেলে সুশান্তই সবাইকে সামাল দিয়েছেন। পিংকি আর রিংকি কেবল জলভর্তি গ্লাসগুলো টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দিয়েছে আর এঁটো প্লেট-গ্লাসগুলো টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করেছে। টেবিলগুলোও ন্যাকড়া দিয়ে সাফ করেছে। খদ্দেররা ওদের দেখে ট্যারা চোখে তাকিয়েছে। কেউ কেউ ওদের সঙ্গে আলাপ করারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু পিংকি-রিংকি তাদের পাত্তা দেয়নি। মেনুতে ছিল চা, কফি, টোস্ট, ডিমের কারি, ভাত আর রুটি।

কোনো খদ্দেরকেই পিংকি-রিংকির ভদ্রলোক বলে মনে হল না। সবারই বেশবাস, চেহারা, চোখের চাউনি কেমন যেন অদ্ভুত—বিশ্রী ধরনের। তাদের বয়স তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। গড় বয়স চল্লিশ।

এই নির্জন পরিবেশে বাইশ জন মাস্তান-মার্কা খদ্দের কোথা থেকে এল, মামাকে পরে এটা পিংকি-রিংকি জিগ্যেস করেছিল। মামা তার উত্তর না দিয়ে শুধু বলেছিলেন, 'কোনো কৌতূহল নয়। মুখ বুজে কাজ করে যাবে।'

পিংকি বলেছিল, 'এটা তো রেস্ট-হাউস। কিন্তু কারোর থাকার ব্যবস্থা তো এখানে দেখছি নে?'

মামা বলেছিলেন, 'আগে যখন কোচবিহারের কোনো এক রাজা এই জলটুঙিটা তৈরি করেছিলেন, তখন এটা নামে আর কাজে দুয়েতেই রেস্ট-হাউস ছিল। স্বাধীনতার প্রায় কুড়ি বছর পরে এই বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। তিনি বাড়িটাকে পুরোদস্তুর সংস্কার করে হোটেল-কাম-রেস্ট্যোরেন্ট বানান। ভালোই চলছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে উগ্রপন্থী আন্দোলন শুরু হলে ঝামেলা বাধল। তিনি দেশে গিয়ে এই আন্দোলনের প্রতিবাদ জানালেন। ফলে উগ্রপন্থীদের গুলিতে তাঁকে প্রাণ হারাতে হল। এরপর তাঁর ছেলে রেস্ট-হাউসটা আমার শ্বশুরের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখন শুধু নামেই এটা রেস্ট-হাউস। সামনে যে সাইনবোর্ডটা রয়েছে, ওটা সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের আমলের। কলকাতার বাবুরা তখন এ-অঞ্চলে বেড়াতে এলে এই বাড়িতে উঠতেন, খেতেন, যদ্দিন খুশি থাকতেন। তারপর যাওয়ার সময় হিসেব মতন খরচা মিটিয়ে দিতেন। জলটুঙি রেস্ট-হাউসের সুনাম তখন বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে

BanglaBook.org

পড়েছিল। বাংলা কাগজে তো বটেই, ইংরেজি কাগজেও ছবিসুদ্ধ জলটুঙির খবর বেরিয়েছিল। তখন থেকে অবাঙালিরা, এমন কী সাহেবরাও এখানে আসতে শুরু করে। ট্যুরিস্টদের কাছে জায়গাটা তখন খুব নিরাপদ ছিল। আর এখন ঠিক তার উল্টো। এখন ভয়ে কোনো ট্যুরিস্ট এর কাছাকাছিও আসে না। যাক গে, অনেক কথা বলে ফেললাম। যা জেনে নিলে, এর বেশি কখনো কিছু জানতে চেও না। মনে রেখো, আমার শ্বশুরমশাই কৌতূহল পছন্দ করেন না।'

২২ সেপ্টেম্বর তারিখে বলহরি তালুকদার জলটুঙিতে ফিরে এসেই সবার সঙ্গে অকারণে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন। পিংকি-রিংকি ভয়ে কাঁপতে লাগল। সুশান্ত মামা কিন্তু যন্ত্রের মতন কাজ করে যেতে লাগলেন। বেলা ১টার সময় বলহরি পিংকিকে ইশারায় কাছে ডেকে শুধোলেন, 'তুই আর তোর বোন এখানে কী কী কাজ করিস?'

'খদ্দেরদের জল দেওয়া, টেবিল সাফ করা আর কাপ-প্লেট-গ্লাস ধোয়া।' মুখস্থ করা বুলির মতন আওড়ে গেল পিংকি।

'কী বললি?' বলেই হাতের কাছে একটা বোতল উনি মেঝের ওপর আছড়ে ভেঙে ফেললেন।

রিংকি এ-সময় একটা টেবিল থেকে এঁটো কাপ-প্লেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ওর হাত থেকে সেগুলো নীচে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল।

'কী করলি?' বলহরি উঠে দাঁড়িয়ে মেঝের ওপর পা ঠুকে রিংকির দিকে রক্ত-চোখে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

রিংকি অজ্ঞান হয়ে মেঝের ওপর পড়ে যেতেই পিংকি ছুটে এল। সুশান্ত মামাও এলেন। রিংকির চোখেমুখে কিছুক্ষণ জলের ছিটে আর মাথায় হাওয়া দিতেই ও চোখ মেলল। সুশান্ত মামা ওকে কোলে করে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

পিংকি এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলহরির চোখে চোখ রাখল। তারপর ধারালো গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'মানুষকে এ-ভাবে ধমকানোর অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?'

'কে মানে?' বলহরি জানতে চাইলেন।

'কে মানে, কে। ফের যদি আপনি আমাকে বা আমার বোনকে কিংবা আমার মামাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেন, আমি আপনার ব্যবসা বন্ধ করে দেব! সাবধান!'

'কী! আমাকে তুই ধমকে কথা বলছিস? এক থাপ্পড়ে আমি তোর গালটা যদি ভেঙে না দিই—।' এই বলে বলহরি দু'পা এগিয়ে এসে পিংকির গালে জোরসে একটা চড় মারলেন। ওর নরম গালে বলহরির শক্ত হাতের কয়েকটা আঙুলের দাগ বসে গেল।

পিংকি চড়-খাওয়া গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ফের বলল, 'আমি

BanglaBook.org

আপনাকে আর-একবার সাবধান করছি।'

'ফের কথা? জানিস নে, আমার নাম বলহরি তালুকদার? আমি হচ্ছি জলটুঙির দুশমন। আমার সঙ্গে কেউ তর্ক করলে আমি তাকে গুলি করে তার দেহটা কুমির দিয়ে খাইয়ে দিই। আবার যদি কথা বলিস, তোরও সেই দশা করে ছাড়ব। বুঝলি?' বলেই উনি ওর অন্য গালে আর-একটা চড় মারলেন।

পিংকি টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু অজ্ঞান হল না। রিংকির চাইতে পিংকির সাহস আর সহ্যশক্তি বেশি। তার ওপর পিংকি ভীষণ জেদি মেয়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল এর শোধ ও তুলবেই তুলবে।

বলহরি সরে গিয়ে চেয়ারে বসে রাগে ফুঁসতে লাগলেন।

পিংকি এ-সময় উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির কাছে চলে গেল। তারপর বলহরির দিকে ঘুরে চোখা গলায় বলে উঠল, 'একদিন এর শোধ নেব।' বলেই ও সিঁড়িতে পা রাখল।

॥ ছয় ॥

কপালীবাবার অভয়বাণী

ইংরেজি মতে রাত বারোটার পরেই তারিখ পালটে যায়। এখন যে-ঘটনাটার কথা বলা হচ্ছে, যেহেতু সেটা শুরু হয়েছিল রাত বারোটার পরে, তাই তারিখটাকে ২২ সেপ্টেম্বর না বলে ২৩ সেপ্টেম্বর বলা হচ্ছে।

২২ সেপ্টেম্বর বলহরি যখন রেস্তোরাঁর ঘরে পিংকি-রিংকির ওপর চড়াও হন, তখন বেলা ১টা। তারপর পিংকি-রিংকি এদিন রেস্তোরাঁয় কাজ করেনি। বাকি সময়টা সামাল দিয়েছেন ওদের মামা।

রাত্তিরে পিংকি-রিংকি কিছু মুখে দিতে চায়নি। ওদের মামা জোর করে দুজনকে দু'মুঠো ভাত খাইয়ে দিলেন।

দুজনের কেউই রাত্তিরে ঘুমোতে পারল না। রিংকির ঘুম এল না ভীষণ ভয়ের জন্য। বলহরির ধমক খাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ও ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে। আর পিংকি ঘুমোতে পারল না মনের যন্ত্রণায়। বলহরির হাতে চড় খাওয়ার পর থেকে রাগে আর অভিমানে ফুঁসছে ও। ওর অভিমান হচ্ছে নিজেরই ওপর। আগে থেকে ভালো করে খোঁজ-খবর না নিয়ে এই বিভীষিকার জায়গায় ওর আসা উচিত হয়নি। ওরই হঠকারিতার জন্য ওর সঙ্গে বোনটাও দুশমনের ফাঁদে পড়ল।

দুজনেই শুয়ে আছে পাশাপাশি। দুজনেই জেগে আছে। কেবলই ওরা উসখুস করছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলল না। অবশেষে রিংকিই প্রথম মুখ খুলল। বলল, 'এই দিদি, তুই ঘুমোসনি?'

BanglaBook.org

পিংকি বলল, 'না, আমার ঘুম আসছে না।'

রিংকি বলল, 'আমারও না।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'আমার মনে হয় "ত্রিশূল" লোকটা ঠিক কথাই বলেছিল। তার উপদেশ মানা আমাদের উচিত ছিল। সে তো আগেভাগেই আমাদের সাবধান করে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল বলহরি তালুকদার খুবই ভয়ংকর লোক।'

এমন সময় রেস্তোরাঁর দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত ১২টা বাজল। আর তার একটু পরেই জলটুঙির ফটকের সামনে পাকা রাস্তার ওপর একটা মোটরগাড়ি থামার আওয়াজ হল। পিংকি খাট থেকে উঠে পুবদিকের জানলার ধারে চলে এসে চাঁদের আলোয় দেখল রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ট্রাক। রিংকিও উঠে এসে ট্রাকটাকে দেখল। তারপর ও পিংকিকে কিছু একটা বলতে যেতেই পিংকি ওকে ইশারায় থামিয়ে দিল।

ট্রাকটার ওপরে ছিল সাত-আট জন ট্রাক-শ্রমিক। তারা বেশ কয়েকটা বড়ো পেটি ট্রাক থেকে নামিয়ে রেস্ট-হাউসের ভেতরে নিয়ে এল। তারপর রেস্ট-হাউসের ভেতর থেকে প্রায় একই সাইজের কয়েকটা পেটি বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে ওঠাল।

এ-সময় ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে একজন লোক নীচে নেমে এসে রেস্ট-হাউসে ঢুকল। তার হাতে একটা অ্যাটাচি-কেস।

পিংকি প্রচণ্ড কৌতূহলী হয়ে পড়ল। ও জানলার কাছ থেকে সরে এল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দরোজার কাছে চলে গেল। দরোজার পাল্লা দুটো ভেজানো ছিল। সে-দুটো অল্প একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকের মধ্যে চোখ রেখে নীচে তাকাল।

রেস্তোরাঁর একটা টেবিলের দু'দিকে বসে রয়েছে দুজন লোক। তাদের একজন বলহরি। অন্য লোকটি এ-দিকে পেছন ফিরে বসায় পিংকি তাকে চিনতে পারল না। তার পরনে রয়েছে পায়জামা-পাঞ্জাবি। অবিশ্যি লোকটা এদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেও পিংকি তাকে চিনতে পারত না, কেননা, বলহরির দলের কোনো লোককেই সে চেনে না।

পিংকি যে লোকটাকে ট্রাক-ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে রেস্তোরাঁর দিকে আসতে দেখেছিল, সেই লোকটা এবার বলহরির পাশেই একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর সে বলহরির সঙ্গে ফিসফিসে গলায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। অবশেষে তৃতীয় লোকটা বলহরির নির্দেশ মতন অ্যাটাচি থেকে কয়েকটা নোটের তোড়া বের করে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটার দিকে এগিয়ে দিল। এই লোকটা কয়েকটা তোড়া পাঞ্জাবির দু'পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে বাকিগুলো বলহরির দিকে বাড়িয়ে ধরল।

পিংকি আর দাঁড়াল না। পাল্লা দুটো আবার আগের মতন করে ভেজিয়ে দিয়ে

BanglaBook.org

নিজের ঘরে ফিরে এল। তারপর পুবদিকের জানলাটার কাছে গিয়ে বাইরে চোখ রাখল।

তৃতীয় লোকটা ফিরে এসে ট্রাকে উঠে ড্রাইভারের পাশে বসতেই ট্রাকটা ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে ট্রাকটা নিজের মুখটাকে উত্তরদিক থেকে ঘুরিয়ে দক্ষিণদিকে করে নিয়েছিল। অর্থাৎ ওটা যে-দিক থেকে এসেছিল, এখন সে-দিকেই ফিরে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় লোকটা জলটুঙি থেকে বেরোয় কি না তা জানার জন্য পিংকি রাত চারটে পর্যন্ত পুবদিকের জানলার ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু লোকটার ছায়া পর্যন্ত ও দেখতে পেল না।

পিংকি কৌতূহল চাপতে না পেরে আবার সিঁড়ির দরোজার কাছে চলে এল। এ-সময় রিংকিও ওর সঙ্গে আসছিল। কিন্তু পিংকির ইশারায় ওকে নিজেদের ঘরেই থাকতে হল।

এবার পিংকি যখন সিঁড়ির দরোজার পাল্লা দুটো ফাঁক করছিল, তখন সামান্য আওয়াজ হল। ভয়ে ওর হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যেতে চাইল।

রেস্তোরাঁর আলোটা এখন নিভানো। পিংকি কাউকে কোথাও দেখতে পেল না। ও তখন দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। এমন সময় সুশান্ত মামা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে ধরে ফেললেন।

'তোমাদের বলেছি না, এখানে কৌতূহল দেখানো নিষেধ? একবার মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি? যাও, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আর কখনো কৌতূহল দেখাবে না।' চাপা গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করেই উনি একরকম জোর করে পিংকিকে ওর ঘরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন।

পিংকি মামাকে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে বলল, 'যে করেই হোক, বলহরিকে পুলিশের হাতে তুলে দেবই দেব।'

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে পিংকি দেখল, রিংকি তখনও পুবদিকের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরের দরোজাটা বন্ধ করে পিংকি কোনো কিছু না ভেবেই চলে এল পশ্চিমদিকের জানলাটার কাছে। আর তখনই ও জলার ওপর ভাসমান ব্রিজটা দেখতে পেল। দ্বিতীয় লোকটা, যার পরনে আছে পায়জামা-পাঞ্জাবি, সে ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে পশ্চিমদিকে চলে যাচ্ছে। ও-দিকটায় আছে গহন বন। সেই বনের ও-পাশে আছে খরস্রোতা ধরলা নদী।

এবারও দ্বিতীয় লোকটার কেবল পেছন দিকটা পিংকি দেখতে পাচ্ছে। লোকটা প্রায় বলহরির মতনই লম্বা। তবে এর চেহারাটা না-রোগা না-মোটা জাতীয়। চাঁদের আলোয় লোকটাকে দেখতে খুব অসুবিধা হল না ওর।

লোকটার পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবি দেখেই পিংকি বুঝে নিয়েছে এ-ই হচ্ছে সেই দ্বিতীয় লোক। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

এ-সময় নীচে একটা দরোজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। পিংকি বুঝে নিল এই ভাসমান সেতুটা রেস্ট-হাউসের যেখানটা থেকে বেরিয়েছে, সেখানে একটা দরোজা আছে। সেই দরোজাটা বলহরি বন্ধ করে দিলেন।

পিংকির মনে অসম্ভব জেদ চেপে গেল। দ্বিতীয় লোকটা কোথায় যাচ্ছে, তা ওকে দেখতেই হবে। ও দেখে নিল রান্নাঘরের উল্টো দিকের ঘরটার নীচে থেকে ভাসমান সেতুটা শুরু হয়েছে। এই ঘর সব সময় বন্ধ থাকে। তবে এতে তালা লাগানো নেই। ও আগেই দেখে রেখেছে।

পিংকির মাথায় একটা মতলব এসে গেল। রিংকিকে ও বলল, 'দেখ রিংকি, এভাবে এখানে মুখ বুজে মার খেতে পারব না। এই জলটুঙিটা যে একটা চোরা-কারবারের ঘাঁটি, সেটা তো দেখলি। পুলিশকে ব্যাপারটা জানাতে হবে। আমি বেরোচ্ছি। তুই এখানে থাক। কেউ আমার কথা জিগ্যেস করলে বলবি বাথরুমে আছি। মনে থাকবে তো?'

'আমার বড্ড ভয় করছে, দিদি।' রিংকি প্রায় কেঁদে ফেলল।

পিংকি বোনকে সাহস দেওয়ার জন্য বলল, 'ভয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই পুলিশকে খবর দিতে হবে। ভয়ে ভয়ে থাকলে শেষে ভয়ের হাতেই মরতে হয়। আমি বেরিয়ে গেলে তুই দরোজাটায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে শুয়ে থাক। কেউ না ডাকলে নিজে থেকে দরোজা খুলবি নে। বাথরুমের দরোজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রাখ।' এই বলে পিংকি হাতে একটা ছোট্ট টর্চ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রিংকি দরোজাটা বন্ধ করতেই ও নিঃশব্দে রান্নাঘরের উল্টো দিকের ঘরটার বন্ধ দরোজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

খুব সাবধানে শিকল খুলে ঘরটার ভেতরে ঢুকে প্রথমে ও দরোজাটা ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিল। তারপর পশ্চিমদিকের জানলাটা খুলে দিল। ও যা আন্দাজ করেছিল, সেটাই ঠিক। এই ঘরটার নীচে থেকেই ফ্লোটিং ব্রিজ বা ভাসমান সেতুটা শুরু হয়েছে।

টর্চ জ্বেলে পিংকি দেখল, ঘরটার মধ্যে পুরোনো বেডিং-পত্তর ডাঁই করে রাখা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা পুরোনো বেড-কভারও রয়েছে। পিংকি দুটো বড়ো বেড-কভার তুলে নিয়ে লম্বালম্বি গিঁট দিয়ে বাঁধল। তারপর সেই জোড়া বেড-কভারের একটা দিক খাটের একটা পায়ার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল। এই খাটটার ওপরেই বেডিং-পত্তর জড়ো করে রাখা আছে।

জানলাটার গরাদ বা শিক ছিল না। পিংকি নীচেটা একবার ভালো করে দেখে নিল। দ্বিতীয় লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। সে এর মধ্যে পশ্চিমদিকের বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

পিংকি বেড-কভারের অন্য দিকটা জানলা গলিয়ে ঝুলিয়ে দিল। তারপর বেড-কভারটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। ব্রিজের

BanglaBook.org

ওপর পা রেখে রেস্ট-হাউসের দরোজাটা বন্ধ আছে দেখে নিয়ে পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগল।

পেছনে ঝুলে থাকল গিঁট দিয়ে জোড়া বেড-কভার দুটো। পিংকি ফিরে আসার আগেই কেউ যদি ও-দুটো দেখতে পায়, পিংকির খোঁজ পড়বে আর ও ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে। ফিরে আসার সময়ও যদি ও বলহরির নজরে পড়ে যায়, তা হলেও ও রক্ষা পাবে না। এ-সব মাথায় রেখেই ও এগিয়ে চলল ব্রিজের ওপর দিয়ে।

এখন সময় ভোর সাড়ে চারটে। ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। পাখিরাও জেগে উঠেছে। তা হোক, সকাল ৭টার আগে বলহরি বা সুশান্ত মামা জাগেন না। তার মধ্যে ফিরে এলেই চলবে। হাতে রয়েছে আড়াই ঘণ্টা সময়।

পিংকি জোরে পা চালিয়ে ব্রিজটা পার হয়ে বনের মধ্যে এসে পড়ল। এখানটায় বেশ অন্ধকার। পায়ে চলা একটা সরু আবছা পথ নদীর দিকে চলে গিয়েছে। সেই পথ ধরে কোনোরকমে এগিয়ে চলল ও। বাঁ দিকে কী একটা সড়সড় করে চলে গেল। সাপ-টাপ হবে। কাছেই একদল শিয়াল রাত্তিরের শেষ প্রহরের কথা জানিয়ে দিল। পিংকি সাপকে ভয় পেলেও শিয়ালকে ভয় পায় না। শিয়ালের ডাককে উপেক্ষা করেই ও পশ্চিমদিকে এগিয়ে চলল। নদীর শব্দ ওর কানে এল। কুলকুল আওয়াজ করে বয়ে চলেছে ধরলা নদী।

অবশেষে বন শেষ হল। নদী দেখা দিল। পাখিদের ডাক আরও স্পষ্ট হল। নদীর ধারেই বেশি পাখি থাকে। তারা সবাই মিলে ডাকতে লাগল।

শরৎকালের ভোরবেলা। আকাশ এ-সময় পরিষ্কার থাকলে ভোরের রূপ হয় অপরূপ। কিন্তু পিংকির এখন ভোরবেলার রূপ দেখার অবসর বা মনের অবস্থা কোনোটাই নেই।

পাড় থেকে জল খানিকটা দূরে। পাড় এখানে ক্রমশ ঢালু হয়ে হয়ে জল পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই ঢালু অংশটাকে বলা হয় তট। আরও শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় পুলিন বা সৈকত। এই অংশে শুধু চিকচিকে বালি।

পিংকি লক্ষ করল বালির ওপর দু'জোড়া পায়ের ছাপ। খুবই স্পষ্ট। লেদার সোলের জুতো পায়ে দিয়ে লোকটা একবার নদীর তট থেকে বনপথে ঢুকেছে। পরে সে বনপথ থেকে বেরিয়ে নদীর তটে এসে পৌঁছেছে। শেষের ছাপটা নতুন। কেননা, বনপথ থেকে বেরিয়ে আসার ছাপটা আগের ছাপটাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। লোকটা বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে বেশি চাপ দিয়ে হাঁটে বলে পিংকির অনুমান। কারণ বাঁ-পায়ের গোড়ালি বালিতে গভীর হয়েছে বেশি।

লোকটা ফিরে গিয়েছে উত্তরদিকে। এসেছেও ও-দিক থেকে। পিংকি তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে উত্তরদিকে এগিয়ে চলল। ছুটতে ছুটতে। খানিকটা দূরে নদীটা পুবদিকে বাঁক নিয়ে পরে ফের উত্তরমুখী হয়েছে। বাঁকটার কাছে এসে

BanglaBook.org

ও দেখতে পেল পাড়ের ওপর রয়েছে একটা ঢিবি। আর সেই ঢিবির ওপর রয়েছে একটা মন্দির আর একটা একতলা পাকা বাড়ি।

মন্দির সমেত বাড়িটার চারদিকে পাঁচিল দেওয়া। নদীর দিকটায় রেলিং দেওয়া একটা ছোট্ট গেট রয়েছে। বাড়ি আর মন্দিরটা দেখেই পিংকি পায়ের ছাপের কথা ভুলে গেল। ও ছুটে চলে গেল গেটটার কাছে। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল, 'শুনছেন? ভেতরে কে আছেন? আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। আমাকে বাঁচান।' কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না।

শেষ পর্যন্ত পিংকি নিরাশ হয়ে পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে সামনের গেটের কাছে চলে এল। এই গেটটাও রেলিং দেওয়া। তবে আগেরটার চাইতে অনেক বড়ো। মোটরগাড়ি ঢুকে যেতে পারে।

গেটের ভেতরে-বাইরে মোরাম বা ইটের কুচি ফেলা পথ। ভেতরের পথটা চলে গিয়েছে মন্দিরের সিঁড়ি পর্যন্ত। বাইরের পথটা বড়ো রাস্তায় গিয়ে মিশেছে।

পিংকি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করল। কিন্তু কারোর সাড়া না পেয়ে ও চলে এল বড়ো রাস্তায়। এখানেও কাউকে দেখতে পেল না। ও তখন ফিরে এল গেটের কাছে। এ-সময় ও দেখতে পেল গেরুয়া পোশাক পরে একজন জটাধারী সন্ন্যাসী মন্দিরের পেছন দিক থেকে সামনের দিকে হেঁটে আসছেন।

পিংকি সন্ন্যাসীকে বলল, 'শুনছেন?'

ডাক শুনে সন্ন্যাসী গেটের দিকে তাকাতেই পিংকিকে দেখতে পেলেন। তারপর অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়েই রইলেন।

পিংকি কাতর গলায় বলল, 'আমাকে বাঁচান, সাধুবাবা। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি।'

সাধুবাবা এগিয়ে এসে আলখাল্লার পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে তা থেকে একটা বিশেষ চাবি বেছে নিয়ে সেটা দিয়ে গেটের তালাটা খুলতে খুলতে মিষ্টি গলায় বললেন, 'আমাকে সবাই কপালীবাবা বলে। তুমি নির্ভয়ে তোমার কথা আমাকে বলতে পারো।'

পিংকি ভেতরে ঢুকে এলে কপালীবাবা ওকে নিয়ে মন্দিরের কাছে চলে এলেন। মন্দিরের সিঁড়ির ওপর ওকে বসতে বলে উনি নিজেও সেখানে বসে পড়লেন। তারপর দরদী গলায় বললেন, 'নাও, এবার তোমার কথা শুরু করো। তোমার বিপদটা কী? গোড়া থেকে বলবে। তবে কিছুটা সংক্ষেপে। দেখো, যেন আসল কথাগুলো বাদ না যায়। তোমার নিজের নাম, বাবার নাম, কোথায় বাড়ি, কেমন করে এখানে এলে, সবকিছু বলবে।'

যতটা কম কথায় সম্ভব, পিংকি সবই বলে গেল। গতকাল সারারাত সারাদিন জলটুঙিতে যা যা ঘটেছিল, তা-ও ও বলে গেল। এমন কী যে লোকটাকে

BanglaBook.org

অনুসরণ করে ও এখানে এসেছে, তার কথাও বলতে ভুলল না। সবশেষে বলল, 'এখুনি থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার।'

কপালীবাবা মোলায়েম গলায় শুধোলেন, 'থানায় খবর দিয়ে কী হবে?'

'পুলিশ এসে বলহরি তালুকদারকে অ্যারেস্ট করবে।'

'কিচ্ছু করবে না রে, বেটি। চোর-ডাকাত-স্মাগলাররা হচ্ছে পুলিশের পোষা লোক। পুলিশের মাথার ওপর আছে দেশের ধুরন্ধর লোকেরা। তারা বখরা খায়। তুমি যদি পুলিশে খবর দিতে যাও, পুলিশই উল্টে তোমাকে হেনস্থা করবে।'

'তা হলে এর প্রতিকার হবে কী করে?'

'প্রতিকার হবে মা-কালীর কৃপায়। তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখো। ধর্মে মতি রাখো। দেখবে শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হবে। অধর্ম দূরে হটবে। দেশে নাস্তিক আর অধার্মিক লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আজ দেশের এই দুর্দশা। সরকারি অফিসে ঘুষখোরের বাসা। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা ছেড়ে স্মাগলিং করছে। দেশে বেকারের সংখ্যা যত বাড়ছে, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানিও তত বাড়ছে। পুলিশ চোর-ডাকাতের কাছে মাসোহারা খায়। কাজেই পুলিশের কাছে গিয়ে কী করবে? জলটুঙিতে কী ঘটছে, না ঘটছে, পুলিশ সবই জানে।'

'তা হলে আমি এখন কী করব?'

'ইচ্ছে করলে তুমি আমার এই আশ্রমেও থাকতে পারো। যদি বলো, তোমার বোনকেও আমি এখানে এনে রাখতে পারি। আমি আরো একটা কাজ করতে পারি। তুমি যখন পুলিশকেই ব্যাপারটা জানাতে চাইছ, তোমার হয়ে পুলিশকে আমিই বলে দিতে পারি। আমি সাধক মানুষ। সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে। কাজেই পুলিশ আমার কথা রাখলেও রাখতে পারে। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।' দরদমাখা গলায় কপালীবাবা কথাগুলো বললেন। তারপর পিংকির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'কী করবে বলো। তুমি নিজে পুলিশকে খবর দেবে, না তোমার হয়ে আমিই তাদের জানাব?'

পিংকি স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনি আমার হয়ে পুলিশকে জানিয়ে দিলে খুবই ভালো হয়।'

'তা না হয় দেওয়া যাবে, কিন্তু তুমি এখন কী করবে?'

একটু ভেবে পিংকি বলল, 'আমি বরং জলটুঙিতেই ফিরে যাই। আমাকে সেখানে দেখতে না পেলে বলহরি তালুকদার আমার বোনকে আর মামাকে আস্ত রাখবে না।'

'তুমি চাইলে আমিও তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। আমাকে দেখলে বলহরি তোমাকে কিছু বলবে না।'

'না, থাক। আপনি তাকে চেনেন না। সে আপনাকেও অপমান করতে পারে। ভীষণ সাংঘাতিক লোক সে। তার পক্ষে কোনো খারাপ কাজ করা অসম্ভব না।

BanglaBook.org

আমি বরং যে-পথে এসেছি, সে-পথেই ফিরে যাচ্ছি।' এই বলে কপালীবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল পিংকি। মন্দিরের দরোজা বন্ধ থাকায় মা-কালীর মূর্তি ও দেখতে পেল না। তা সত্ত্বেও মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে মা-কালীকে নমস্কার জানাল। তারপর গেট দিয়ে বেরিয়ে এল।

কপালীবাবার দর্শন পেয়ে, ওঁর সঙ্গে কথা বলে মনের মধ্যে যথেষ্ট জোর পেয়েছে পিংকি।

॥ সাত ॥

জলটুঙিতে নরহত্যা

বাইশ ও তেইশ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর বেশ কিছুদিন দিনে বা রাতে একটা ট্রাককেও পিংকি-রিংকি জলটুঙির সামনে থামতে দেখেনি। তা ছাড়া বলহরির আচরণেও পরিবর্তন এসেছিল। তিনি পিংকি-রিংকির সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। একদিন হঠাৎ এসে ওদের খাটের ওপর বসে পড়লেন। দু'বোনকে দু'পাশে বসিয়ে নরম গলায় বললেন, 'তোরা ভাবিস, এই দাদুটা একটা দুর্দান্ত দৈত্য, তাই না?'

পিংকি বলল, 'হঠাৎ এ-কথা কেন বলছ, দাদু?'

'হঠাৎ নয় রে, দিদিভাই, হঠাৎ নয়। এই জলটুঙিটা কেনার আগে পর্যন্ত আমিও তোদের মতন ভালোমানুষ ছিলাম। আমার বউ ছিল, মেয়ে ছিল। তখন আমার একটা ছোটো হোটেল ছিল তুফানগঞ্জে। খুব সুখে ছিলাম। তারপর বড়োলোক হওয়ার আশায় একজন পাঞ্জাবির কাছ থেকে এই জলটুঙি-রেস্টহাউসটা কিনে নিই। তারপরই শনির কোপে পড়লাম। আমার মেয়ে আর বউ, দুজনেই কঠিন অসুখে মারা গেল। আর আমিও কুচক্রীদের খপ্পরে পড়ে গেলাম।' বলহরি একটু থামলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'তোদের, সুশান্তর, আমার, সকলের ভালোর জন্যেই বলছি, এই জলটুঙির ব্যাপারে কখনো কোনো কৌতূহল দেখাবি নে। এর বাইরে যাওয়ারও কখনো চেষ্টা করবি নে। এতে আমাদের সকলেরই ভালো হবে। তা না হলে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না।'

রিংকি বলল, 'দাদু, আমরা সবাই মিলে যদি এখান থেকে পালিয়ে যাই?'

'পালিয়ে যাব? না, দিদিভাই, পালিয়েও আমরা রেহাই পাব না। শেষে বেঘোরে শয়তানের গুলি খেয়ে মরতে হবে।'

পিংকি বলল, 'আমরা যদি পুলিশের সাহায্য নিই?'

'পুলিশ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! পুলিশ তো নিজেই নিজের মাথা বাঁচাতে পারে না, আমাদের বাঁচাবে কী করে? এই জলটুঙিতে থেকেই আমাদের বাঁচার চেষ্টা

BanglaBook.org

করতে হবে। যাক গে, অনেক কথা বলে ফেললাম। তোরা আমার পরামর্শ মতন চলিস।' এই বলে বলহরি উঠে পড়লেন।

বলহরির চরিত্র-রহস্য পিংকি-রিংকির কাছে অজানাই থেকে গেল। জলটুঙির আসল বিভীষিকা কে, সেটাও ওরা জানতে পারল না।

পরে পিংকি একদিন সুশান্তকে শুধিয়েছিল, 'মামা, ত্রিশূল লোকটা কে?'

ত্রিশূলের নাম শুনেই সুশান্ত বেশ চমকে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'তোরা ত্রিশূলের কথা জানলি কী করে?'

'সে-ই তো আমাদের এখানে চিঠি দিয়ে আসতে বারণ করেছিল।'

'তাই নাকি? তা হলে তো তোদের আসা ঠিক হয়নি। ত্রিশূলের কথা কেউ অমান্য করতে পারে না, এমনকি আমার শ্বশুরমশাইও না।'

'তুমি তাঁকে কোনো দিন দেখেছ?'

'না। ত্রিশূলকে দেখা যায় না। ত্রিশূল হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি। সে নির্দেশ দেয় চিঠি লিখে। তার নির্দেশ কেউ অমান্য করে না। করলেই বিপদ। যাক গে, আর কথা নয়। কৌতূহল বিপদ বাড়াবে। তার চাইতে তোরা যেমন আছিস, তেমনি থাক।'

এরপর জলটুঙির ব্যাপারে পিংকি-রিংকি বেশ কিছুদিন কৌতূহল দেখায়নি। জলটুঙির বাইরে যাওয়ারও ওরা চেষ্টা করেনি। কিন্তু তারপরই এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা ওদের বেপরোয়া করে তুলল।

সেদিনটা ছিল বুধবার, এগারো অক্টোবর। দুর্গাপুজোর তিনদিন বাকি। রাত তখন একটা।

বোমার বিকট শব্দটা রিংকির কানেই প্রথম গিয়েছিল। সেই শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই ও দিদিকে ঠেলা দিয়ে জাগাল। এ-সময় আরও একবার শব্দ হল। পিংকি-রিংকি ছুটে গেল পুবদিকের জানলার ধারে।

একটা মোটরগাড়িতে চড়ে কয়েকজন লোক এসে জলটুঙি লক্ষ করে বোমা ছুঁড়ছে। তিন-নম্বর বোমাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জলের জলে এসে পড়ল। এমন সময় মেশিনগান হাতে বলহরি জলটুঙি থেকে বেরিয়ে এলে আক্রমণকারীরা পালাতে গেল। কিন্তু তার আগেই মেশিনগানের গুলিতে টায়ার পাংচার হয়ে তাদের গাড়িটা রাস্তার একপাশে উল্টে পড়ল।

বলহরি বন্দুক হাতে ছুটে গিয়ে আরোহীদের হুকুম করলেন, 'কোনোরকম চালাকি না করে বেরিয়ে এসে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়া।' গাড়ি থেকে মোট চারজন লোক বেরিয়ে এসে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াল। তারপর তারা বলহরির আদেশে রেস্টহাউসের দিকে এগোতে লাগল। চারজনই গুলি খেয়ে খোঁড়াচ্ছে। ওরা রেস্তোরাঁয় ঢোকার কিছুক্ষণ বাদে রেস্টহাউসের পেছন দিকের দরোজায় কেউ একজন জোরে নক করল।

BanglaBook.org

পিংকি পশ্চিমদিকের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল একজন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোক ভাসমান ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দরোজায় নক করছে। একটু পরে দরোজাটা খুলে যেতে লোকটা ভেতরে ঢুকে পড়ল। পিংকি-রিংকি সিঁড়ির দরোজার কাছে এসে তার পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক করে সেখানে নিঃশব্দে বসে রইল।

বন্দীরা বসে আছে মেঝের ওপর। তাদের হাতগুলো পিছমোড়া করে বাঁধা। পশ্চিমদিক থেকে যে লোকটা এল, সে সিঁড়ির দিকে পেছন ফিরে একটা চেয়ারে বসল। সে ইশারা করতেই বলহরি বন্দীদের শুধোলেন, 'তোদের কে পাঠিয়েছে বল।'

বন্দীরা কেউই মুখ খুলল না। লোকটা ফের বলহরিকে ইশারা করল। বলহরি বললেন, 'তোদের চারজনকেই মরতে হবে। যদি বাঁচতে চাস, এখনো বল, কে তোদের এখানে পাঠিয়েছে।'

লোকগুলো তবুও চুপ করে রইল। বলহরি এবার বন্দুক তাগ করে বললেন, 'এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব। এর মধ্যে উত্তর চাই। এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত-আট-নয়-দশ।' কয়েক সেকেন্ড বলহরি অপেক্ষা করলেন। তারপর সেই লোকটার ইশারায় গুলি চালিয়ে দিলেন।

পিংকি-রিংকি ভয়ে সিঁড়ির দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজেদের ঘরে চলে এল। তারপর পশ্চিমদিকের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল, বলহরি একে একে ডেডবডিগুলো সেতুর ওপর থেকে জলার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অমনি জলের মধ্যে তীব্র আলোড়ন উঠল। কাজ শেষ হতেই পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা লোকটা ব্রিজের ওপর দিয়ে পশ্চিমদিকে চলে গেল। বলহরিও ফিরে এলেন রেস্ট-হাউসের মধ্যে।

পিংকি-রিংকি জানলার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল ওদের মামা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তিনি ওদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যা দেখলে, ভুলে যাও। কেউ কখনো জিগ্যেস করলে বলবে, কিচ্ছু দেখিনি। কিচ্ছু জানি নে। এমনকি আমার শ্বশুরমশাই যদি জিগ্যেস করেন, তাঁকেও ওই একই উত্তর দেবে।' কথা কটা বলে সুশান্ত মামা নিজের ঘরে চলে গেলেন।

রিংকি দরোজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর পিংকিকে শুধোল, 'দিদি, তুমি এখন কী করবে?'

পিংকি বলল, 'ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়া যাক। তিনটের সময় বেরোব। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ডেকে দিস।' এই বলে ও খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

রাত তিনটে বাজতেই রিংকি পিংকিকে জাগিয়ে দিল। তারপর পিংকি আগের কায়দায় রান্নাঘরের উল্টোদিকের ঘরটার জানলা দিয়ে ব্রিজের ওপর নেমে পশ্চিমদিকে হাঁটা ধরল।

BanglaBook.org

প্রথমে আশ্রমের পেছনের গেটে, তারপর সামনের গেটে দাঁড়িয়ে পিংকি কপালীবাবাকে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করল। কোনো সাড়া পেল না। ও তখন বড়ো রাস্তা ধরে সোজা উত্তরদিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ও আকালপুরে চলে এল। তখন ভোর হয় হয়।

কয়েকজন যুবক লাঠি হাতে গ্রামে পাহারা দিচ্ছিল। পিংকিকে দেখেই তারা ছুটে এল। পিংকি তাদের বলল, 'ভীষণ বিপদে পড়েছি। কিংশুকদার বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?'

'কিংশুকদা মানে কিংদা তো? তিনি তো নেই। কোচবিহার গিয়েছেন। ওঁর ভাগনীর বিয়ে ছিল।' যুবকদের একজন উত্তর দিল।

প্রথমটা হতাশ হয়ে পড়ল পিংকি, তারপর বলল, 'এই গ্রামে কি অন্য কোনো রিকশাওয়ালা নেই, যে আমাকে দিনহাটায় নিয়ে যেতে পারে?'

রিকশা ঠিক করতে একটু সময় লাগল। কেননা, যার রিকশায় পিংকি যাবে, সে তখন গভীর ঘুমে ডুবে ছিল। তাকে ডেকে তোলা হল। তারপর সে জামা-প্যান্ট পরে প্রস্তুত হল।

পিংকি রিকশায় উঠে যখন রওনা হবে, তখন একজন যুবক শুধোল, 'কিংদা ফিরে এলে কিছু বলতে হবে?'

'বলবেন জলটুঙি থেকে পিংকি এসেছিল। সে ভীষণ বিপদে পড়ে থানায় যাচ্ছে।'

যেতে যেতে পিংকি ভাবল, ও যদি একা থানায় যায়, তাহলে সেখানকার বড়োবাবু ওকে পাত্তা নাও দিতে পারেন। কপালীবাবা আগে ওকে এরকম কথাই বলেছিলেন। ও তাই ঠিক করল, আগে যাবে নিমাই-নিতাইয়ের বাড়িতে, যারা বলেছিল, বিপদ দেখলে ও যেন দিনহাটায় পোস্ট-অফিসের উল্টোদিকের একতলা বাড়িটায় তাদের খোঁজ করে। রিকশাওয়ালাকে পিংকি বলল, 'থানায় যাওয়ার আগে একবার পোস্ট-অফিসের উল্টোদিকের একটা বাড়িতে যাব। পোস্ট-অফিস চেনেন তো?'

রিকশাওয়ালা বলল, 'চিনব না? কার বাড়িতে যাবেন?'

'নিমাই-নিতাইয়ের বাড়িতে।'

'তাদেরও আমি চিনি।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে পিংকি নিমাই-নিতাইয়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। পিংকি রিকশা থেকে নেমে বাড়িটার সদর দরোজার কড়া নাড়ল। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ একজন ঘুম-জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'কে?'

পিংকি বলল, 'আমি পিংকি। জলটুঙি থেকে আসছি।'

আর বলতে হল না। নিতাই এসে দরোজা খুলে দিল। বলল, 'কী ব্যাপার? এই ভোর রাত্তিরে?'

BanglaBook.org

'আমাকে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে। ভীষণ বিপদে পড়েছি।'

নিমাই বলল, 'ঠিক আছে, আমিই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। ভেতরে এসে পাঁচ মিনিট বসো। হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাও।'

'আমার চা খাওয়ার সময় নেই। পরে একদিন এসে খাব। আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন।' কাতর গলায় পিংকি বলল।

নিমাইয়ের রেডি হতে বেশি সময় লাগল না। যে রিকশায় পিংকি এখানে এসেছিল, সেই রিকশাতেই ওরা থানায় গেল।

থানাতেও বিপত্তি। বড়োবাবু অনুপস্থিত। তিনি আগের রাত্তিরে বাহিনী নিয়ে গাজিপুর গিয়েছেন। সেখানে দু'দল লোকের মধ্যে খুনোখুনি হয়েছে। যে অফিসার তখন থানার চার্জে ছিলেন, তিনি পিংকির বক্তব্য লিখে নিলেন। লেখার নীচে পিংকিকে দিয়ে সই করালেন। তারপর বললেন, 'জলটুঙির কথা আমাদের কানেও উড়োভাসা এসেছে। কিন্তু এতটা যে ঘটছে, তোমার আগে কেউ আমাদের বলেনি।'

'কপালীবাবা কিছু বলেননি?' পিংকি জানতে চাইল।

অফিসার বললেন, 'কপালীবাবা কে?'

পিংকি বলল, 'জলটুঙি যাওয়ার পথে ডানহাতে তাঁর আশ্রম পড়ে। সেখানে একটা মন্দির আছে।'

'বুঝেছি। কিন্তু আমি তাঁকে কোনোদিন থানায় দেখিনি। তবে আমি অফ-ডিউটিতে থাকার সময় বড়োবাবুকে কিছু বলে গিয়েছেন কি না বলতে পারব না।' একটু থেমে অফিসার ফের বললেন, 'তুমি কি এখন এখানে অপেক্ষা করবে, না কি জলটুঙিতে ফিরে যাবে?'

'ফিরে যাব। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা বলহরি তালুকদারকে অ্যারেস্ট করুন।' পিংকি উঠে পড়ল।

অফিসার বললেন, 'তুমি তো নিজের চোখেই দেখছ, থানায় এখন আমরা মোট দুজন লোক আছি। তবে কথা দিচ্ছি বড়োবাবু ফিরলেই এনকোয়ারির ব্যবস্থা হবে।'

পিংকিরা ফিরে চলল। পথে নিমাই নেমে গেল। তার আগে বলে গেল, 'যদি দেখো, জলটুঙিতে থাকলে তোমাদের বিপদ আরো বাড়বে, তুমি আর তোমার বোন এখানে চলে আসবে। ভালো কথা, তুমি তো জলটুঙি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছিলে, সঙ্গে রিকশাভাড়ার টাকা আছে তো?'

পিংকি যখন জানাল ভাড়ার টাকা আছে, তখন নিমাই ওকে যেতে দিল। কপালীবাবার আশ্রমের গেটের সামনে এসে পিংকি রিকশাটাকে ভাড়া চুকিয়ে ছেড়ে দিল। তারপর গেটের সামনে গিয়ে উঁচু গলায় বলল, 'সাধুবাবা আছেন?'

কপালীবাবা ছিলেন মন্দিরের মধ্যে। পিংকির ডাক কানে যেতেই তিনি বেরিয়ে

BanglaBook.org

এলেন। দরদভরা গলায় বলে উঠলেন, 'কী রে বেটি, আজ আবার কী হল?'

'ভীষণ বিপদে পড়েছি, সাধুবাবা।' পিংকি বলল।

'বিপদ তো আমাদের বন্ধু রে, বেটি।' কথাগুলো বলতে বলতে কপালীবাবা গেটটা খুলে দিলেন, 'ভেতরে আয়। আগে শুনি তারপর দেখি তোকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারি কি না।' এই বলে পিংকিকে নিয়ে উনি মন্দিরের সিঁড়ির কাছে চলে এলেন। নিজে সিঁড়ির একটা ধাপের ওপর বসে ওকেও সেখানে বসতে বললেন।

পিংকি বসতে বসতে বলল, 'কাল রাত্তিরে জলটুঙিতে চারজন লোক খুন হয়েছে।'

'কী বলছিস, বেটি? চারজন লোক খুন হয়েছে!' কপালীবাবার গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। তারপর নিজেকে শুধরে নিয়ে শুধোলেন, 'তুই নিজের চোখে খুন হতে দেখেছিস?'

'আমি আর আমার বোন দুজনেই সিঁড়ির দরোজা ফাঁক করে দেখেছি বলহরি তালুকদার রেস্তোরাঁর ঘরে চারজন লোককে গুলি করে মারল। মনে হয় তারা বলহরির শত্রু। কারণ তারা একটা মোটরগাড়িতে চড়ে এসে জলটুঙি লক্ষ করে বোমা ছুঁড়ছিল।'

'তারপর বলহরি তাদের ওপর চড়াও হয়। তাদের পাকড়াও করে রেস্তোরাঁর ঘরে নিয়ে এসে গুলি করে মেরে ফেলে। তাই কি না?'

'তাই।'

'সে-সময় ঘরে আর কেউ ছিল?'

'আরও একজন ছিল।'

'তাকে দেখিসনি?'

'মুখ দেখতে পাইনি। সে সিঁড়ির দিকে পেছন ফিরে বসেছিল।'

'চেহারা কেমন?'

'লম্বা, মোটা নয়, আবার খুব রোগাও নয়। লোকটার পরনে ছিল পায়জামা-পাঞ্জাবি। আপনার এখানে আগে যেদিন এসেছিলাম, সেদিনও ওকে দেখেছিলাম।'

'কী করে বুঝলি, এই লোকই সেই লোক?'

'একই রকম চেহারা আর একই রকম পোশাক দেখে। তাছাড়া সেদিনও সে কোনো কথা বলেনি, কালও বলেনি।'

'লোকটা তো নিজের হাতে খুন করেনি।'

'তা না করলেও বলহরিকে সে খুন করার জন্যে ইশারা করছিল।'

'লোকটা তো তোর দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। তা হলে কী করে বুঝলি সে বলহরিকে হুকুম করছিল লোকগুলোকে খুন করার জন্যে?'

'আমার তাই মনে হয়েছিল।'

BanglaBook.org

'মনে হওয়া আর দেখা এক কথা নয়। লোকটার হাতে কোনো বন্দুক বা অস্ত্রটস্ত্র ছিল?'

'দেখিনি। মনে হয় খালি হাতেই ছিল।'

'ডেডবডিগুলোর কী গতি হল?'

'বলহরিদাদু নিজে গিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিল আর জল যেন তোলপাড় হয়ে উঠল।'

'তারপর?'

'পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা ভেসে থাকা ব্রিজের ওপর দিয়ে নদীর দিকে চলে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে আমি ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে জলাটা পার হয়ে আপনার আশ্রমের কাছে আসি। অনেক ডাকাডাকি করেও আপনার সাড়া না পেয়ে আকালপুর যাই। সেখান থেকে একটা রিকশায় চড়ে দিনহাটা থানায় যাই। থানায় তখন বড়োবাবু ছিলেন না। অন্য একজন আমার কথাগুলো একটা মোটা খাতায় লিখে নিয়ে তার তলায় আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিলেন। বললেন, বড়োবাবু ফিরে এলেই জলটুঙিতে এনকোয়ারির ব্যবস্থা হবে।'

'তারপর?'

'তারপর রিকশায় চড়ে সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।'

'ভালোই করেছিস রে, বেটি। তবে প্রথমে যখন এসেছিলি, তখন দেখা হলে আরো ভালো হত। এখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।'

'দেরি হয়ে গিয়েছে বলছেন কেন?'

'বলহরি এর মধ্যে খুনের সব রকম প্রমাণ লোপাট করে ফেলেছে।'

'রাস্তার ধারে উল্টে থাকা মোটর গাড়িটা নিশ্চয়ই লোপাট করতে পারেনি। তাতে গুলি আর রক্তের দাগ আছে।'

কপালীবাবা পিংকির কথা শুনে একটু হাসলেন। তারপর ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বলহরি এত কাঁচা লোক নয় রে, বেটি। সেই গাড়িটাকে সে ট্রাকে তুলে বর্ডার পার করে দিয়েছে।'

'আপনি জানলেন কী করে?' পিংকি অবাক স্বরে জানতে চাইল।

কপালীবাবা মিষ্টি করে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, 'সাধুরা এমন কিছু জিনিস দেখতে পায়, যা সাধারণ লোকে পায় না। বলহরি আগেও অনেকবার মানুষ খুন করেছে বলে শোনা যায়, কিন্তু পুলিশ আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রমাণ পায়নি। যাক গে, তুই আমাকে এখন কী করতে বলছিস?'

'বলহরি তালুকদার যাতে শাস্তি পায়, তার ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।'

'সবই মা-কালীর ইচ্ছে রে, বেটি। তিনি যদি বলহরির ফাঁসি চান, কেউ তার ফাঁসি রুখতে পারবে না।'

'আর সেই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটার যাতে শাস্তি হয়, সেটাও

BanglaBook.org

আপনাকে দেখতে হবে।'

'এবারেও ওই একই উত্তর। তবে প্রমাণের অভাবে সে ছাড়া পেয়ে যেতে পারে। প্রথমত তার মুখ কেউ দেখতে পায়নি। দ্বিতীয়ত সে খুন করেছে, এমন প্রমাণও নেই। বলহরি ছাড়া কেউই তাকে চেনে না। কাজেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে যদি বলহরি মারা পড়ে, তা হলে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা বুক ফুলিয়ে বেঁচে থাকবে।'

'বলহরি মারা পড়বে কেন?'

'পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা নিজে বাঁচার জন্যে বলহরিকে মেরে ফেলতে পারে। এটাও অবিশ্যি আমার অনুমান।' একটু হেসে উনি ফের বললেন, 'চল বেটি, তোকে জলটুঙিতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পিংকি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনাকে কষ্ট করে সেখানে যেতে হবে না। আমি যে-পথ দিয়ে এসেছি, সে-পথ দিয়েই ফিরে যেতে পারব।'

॥ আট ॥

লোকটা কে?

'এই জায়গাটার নাম কোচবিহার হল কেন, বলতে পারবে?' প্রফেসর বিশ্বাস জিৎকে শুধোলেন।

জিৎ বলল, 'আগে এখানে কোচদের বিহার ছিল বলে এর কোচবিহার নাম হয়েছে।'

'এটুকু বললেই উত্তর হয় না।' প্রফেসর বিশ্বাস মন্তব্য করলেন।

গণেশ হালদার এ-সময় রেস্তোরাঁর ভেতরে কাম আর বাইরে চোখ রেখে নস্যি টানছিল। প্রফেসর বিশ্বাসের মন্তব্যটা কানে যেতেই ওঁর দিকে ঘুরে বলে উঠল, 'আমি বলছি। 'বোড়ো' উপগোষ্ঠীর একটা শাখাগোষ্ঠী হচ্ছে কোচ। প্রায় এক হাজার বছর আগে বোড়ো উপগোষ্ঠীর লোকেরা, যারা আসলে মোঙ্গোলীয়, রক্তের দিক থেকে যাদের মিল আছে কোচ আর গারোদের সঙ্গে, তারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ঘর বেঁধেছিল। পরে তাদেরই একটা শাখা উত্তর বাংলায়, এমনকি উত্তর বিহারেও ছড়িয়ে পড়ে। এই শাখাগোষ্ঠীর লোকেরাই কোচ।'

প্রফেসর বিশ্বাস গণেশ হালদারের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন, 'বাহ্! এমন গুছিয়ে আমিও বলতে পারতাম না। এই কোচদের কিন্তু এখন আর আলাদা করে চেনা যাবে না। তারা মূলস্রোতে মিশে গিয়েছে।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'ফিফটিনথ সেনচুরিতে কামরূপের পশ্চিম অংশে কামতা নামে একটা স্বাধীন রাজ্যের পত্তন হয়। পরে এর নাম হয় কোচবিহার। ১৮৯৬ সালে সরকারি নথিপত্রে এই নাম স্বীকৃতি পায়।'

BanglaBook.org

জিতের বোন বুড়ি রাজা-রাজড়ার গল্প পেলে মজে যায়। প্রফেসর বিশ্বাস থামতেই ও বলে উঠল, 'কামতা রাজ্যের রাজাদের কথা বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

বুড়ির কথায় প্রফেসর বিশ্বাস বিরক্ত না হয়ে খুশি হলেন। বললেন, 'কামতা রাজ্যের রাজাদের গল্প অনেকটা রূপকথার মতন। অথচ ইতিহাসের মতন সে সব সত্যি ঘটনা।'

'তার মানে, গল্প হলেও সত্যি। তাই তো?' বুড়ি বলল।

'ঠিক তা-ই। আবার এগুলোকে ইতিহাসের গল্পও বলা চলে। যাক গে, এখন শোনো।'

প্রফেসর বিশ্বাসের সঙ্গে গণেশ হালদারের আলাপ কোচবিহারের এই অলকা হোটেলে। ওরা আজই, অর্থাৎ মঙ্গলবার, সতেরো অক্টোবর, বিজয়া দশমীর দিন কোচবিহার পৌঁছেছে। যাবে দিনহাটায়।

প্রফেসর বিশ্বাসের পুরো নাম কল্লোল বিশ্বাস। শোনা যায়, এক-সময় কোনো এক কলেজে পড়াতেন। এঁর বাড়ি কোথায়, কেউ জানে না। তবে কোচবিহার এলে অলকা হোটেলেই ওঠেন। তাই দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একুশ নম্বর ঘরটা প্রায় সারা বছরই এঁর নামে বুক করা থাকে।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মেদহীন বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ের রঙ প্রায় ফরসা। ছ'ফুটের মতন লম্বা। মুখের শ্রী নষ্ট হয়েছে কপালে আর ডানদিকের গালে নজরে পড়ার মতন দুটো কাটা দাগ থাকায়। মাথার আধপাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে ফিনফিনে ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ভারী গলায় কথা বলেন জোরে। উচ্চারণ স্পষ্ট। সহজেই লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন।

প্রফেসর বিশ্বাস এবার শুরু করলেন কামতার রাজাদের গল্প

'কামতার অবস্থান কামরূপের পশ্চিমে। পনেরো শতকে এর পত্তন। এখানে রাজত্ব করতেন খেন বংশের রাজারা। মোট তিনজন খেনরাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁর হচ্ছেন নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ আর নীলাম্বর। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নীলাম্বর। ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯৮ বা ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। গৌড়ের রাজা হোসেন শাহ তাঁর রাজ্যটা কেড়ে নেন। খেনরাজাদের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ দিনহাটা থানায় এখনও দেখা যায়। এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে ছিল রাজপ্রাসাদ। সেটা এখন ঢিবি হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকে এই ঢিবিটাকে রাজপাট বলে।'

বুড়ি বলল, 'রাজপাটে গুপ্তধন নেই?'

'থাকলেও থাকতে পারে। রাজা নীলাম্বর রাজধানী থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর টাকাকড়ি নিয়ে যেতে পারেননি। আবার হোসেন শাহ বা তাঁর

BanglaBook.org

লোকেরাও সে-সবের সন্ধান পাননি। লোকে বলে, কামতাদুর্গের কোনো জায়গায় তিনি তাঁর টাকাকড়ি সোনাদানা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত তা কেউ খুঁজে পায়নি।' একটু থেমে প্রফেসর বিশ্বাস ফের বললেন, 'রাজপাটে গিয়ে খেনরাজাদের গুপ্তধন খুঁজে দেখবে নাকি?'

বুড়ি বলল, 'গেলে মন্দ হয় না। গুপ্তধন খোঁজার গল্প পড়ার চাইতে গুপ্তধন খুঁজলে বেশি মজা হবে।'

প্রফেসর বিশ্বাস গণেশ হালদারের দিকে ঘুরে বললেন, 'মিস্টার হালদার কী বলেন?'

গণেশ হালদার বলল, 'আমরা অন্য একটা ব্যাপারে দিনহাটায় যাচ্ছি। গুপ্তধন খোঁজার সময় পাওয়া যাবে না। তবে রাজপাটের ঢিবিটা একবার দেখে আসা যেতে পারে। গুপ্তধন না থাকলেও সেখানে ইতিহাসের উপাদান তো আছেই। গুপ্তধনের চাইতে তার দামই বা কম কিসে?'

জিৎ অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছে, ওদের পাশের টেবিলে বসে একজন লোক মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে আর খবরের কাগজে চোখ রেখে, কান খাড়া করে ওদের কথাবার্তা শুনছে। লোকটার চেহারা মজবুত, মাথায় টাক, কানদুটো ভীষণ লোমশ আর শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়ো, যা সহজেই চোখে পড়ে। লোকটার চোখে কালো চশমা, পরনে ছাইরঙের সাফারি স্যুট।

প্রফেসর বিশ্বাস গণেশ হালদারের শেষ কথাটায় সায় দিয়ে বললেন, 'মোটেই কম নয়, বরং বেশি। জাদুঘরে গেলে এটা ভালো করে বোঝা যায়।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'রাজপাটে যদি যান, আমিও আপনাদের সঙ্গী হতে পারি। বিশেষ করে আপনার মতন একজন নামকরা গোয়েন্দার সঙ্গ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। দিনহাটায় কোথায়—।' এরপর উনি লোমশ কান লোকটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কোচবিহারে এখন মূর্তিচোরদের রাজত্ব চলছে। আপনাকে দেখেও তো মূর্তিচোর বলে মনে হচ্ছে।'

'সাবধান! ফের আমাকে চোর বললে আমি তোমাকে খতম করে দেব।' লোমশ কান লোকটা গর্জন করে উঠল।

'আহ্, রেগে যাচ্ছ কেন? তুমি যদি চোর না হয়ে সাধু হও, সাধুভাষায় কথা বলো।' হাল্কা গলায় প্রফেসর বিশ্বাস উচ্চারণ করলেন।

'তবে রে!' বলেই লোমশ কান লোকটা পকেট থেকে রিভলবার বের করল।

প্রফেসর বিশ্বাস ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ওটা পকেটে রেখে দিয়ে ভালো ছেলের মতন সাতবার কান ধরে ওঠবস কর।'

লোমশ কান লোকটা আরও রেগে গিয়ে রিভলবারটা প্রফেসর বিশ্বাসের দিকে তাক করতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রফেসর বিশ্বাসের ছোঁড়া চায়ের কাপটা এসে লাগল ওর রিভলবার ধরা হাতের কব্জিতে।

BanglaBook.org

মোক্ষম আঘাত। রিভলবারটা মেঝের ওপর পড়ে যেতেই প্রফেসর বিশ্বাস সেটা কুড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। লোমশ কান লোকটা অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রফেসর বিশ্বাসের ওপর। কিন্তু প্রফেসর বিশ্বাস আরও তৎপর। উনি চোখের নিমেষে একপাশে সরে গেলেন। লোকটা টাল সামলাতে না পেরে দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেল। ওর কপালটা কেটে গেল। প্রফেসর বিশ্বাস ওর জামার কলার ধরে ওকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'বল, কী শাস্তি তুই চাস?'

লোকটা কেঁচো হয়ে গেল। ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

গণেশ হালদার বলল, 'প্রফেসর, ওকে ছেড়ে দিন।'

প্রফেসর বিশ্বাস মুখে হাসি ফুটিয়ে গণেশ হালদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলছেন?'

লোমশ কান লোকটা অমনি প্রফেসর বিশ্বাসের আনমনা হওয়ার সুযোগ নিয়ে ওঁর হাতে একটা চাঁটি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তারপর রেস্তোরাঁর খোলা দরোজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। প্রফেসর বিশ্বাস সেদিকে তাকিয়ে হাঃ-হাঃ করে হেসে উঠলেন।

বুড়ি বলল, 'বাপ রে, কী সাংঘাতিক লোক! ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল।'

জিৎ শুধোল, 'লোকটা কে?'

প্রফেসর বললেন, 'আমারও ঠিক একই প্রশ্ন, লোকটা কে? কিন্তু তোমার কাকুর জন্যে উত্তরটা জানা গেল না। লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি। এ-অঞ্চলে নতুন আমদানি।'

জিৎদের পোষা বাঁদর সুন্দর ছুটে গিয়েছিল লোকটাকে ধরার জন্য। সেটা কেউ লক্ষ করেনি। একটু পরে সে ফিরে এল হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে।

গণেশ হালদার কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখল, তাতে লেখা রয়েছে 'সাবধান! বলহরির দল ছেড়ে নাগরাজের দলে ঢুকে তুই নিজের বিপদ ডেকে এনেছিস। মনে রাখিস, দল ছাড়ার নাম মৃত্যু।' এরপর স্বাক্ষরের জায়গায় আঁকা রয়েছে একটা ত্রিশূলের ছবি।

প্রফেসর বললেন, 'ওটা কে কাকে লিখেছে?'

গণেশ হালদার বলল, 'কোনো এক "ত্রিশূল" ওই পালিয়ে যাওয়া লোকটাকে লিখেছে। লোকটা আগে বলহরি নামে কোনো এক ওস্তাদের দলে কাজ করত। এখন সে বলহরির দল ছেড়ে নাগরাজের দলে ঢুকেছে।'

প্রফেসর হাসতে হাসতে বললেন, 'এ যে দেখছি ফুটবলারদের মতন দলবদল! প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এই বলহরি আর নাগরাজ?'

BanglaBook.org

গণেশ হালদার বলল, 'তার চাইতেও বড়ো প্রশ্ন, কে এই "ত্রিশূল"? এই বলে চিরকুটটা ও প্রফেসরের হাতে ধরিয়ে দিল।

॥ নয় ॥

কেউটের ফণা

সাপটা গোখরো ছিল, না কেউটে, জিৎ তা বলতে পারবে না। কিন্তু সাপটাকে বাগানের রাস্তার ওপর দেখেই বুড়ি ভয়ে 'কেউটে কেউটে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। বলাই বাহুল্য, জিৎও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

দিনহাটায় এসে জিৎরা ইচ্ছা করলে এখানকার থানার বড়োবাবু নীলাম্বর মজুমদারের কোয়ার্টারে উঠতে পারত। কেননা, নীলাম্বরবাবু হচ্ছেন গণেশ হালদারের ক্লাস-মেট, আর তাঁরই কাজে গণেশ হালদাররা দিনহাটায় এসেছে। নীলাম্বরবাবুরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল ওরা ওঁর কোয়ার্টারেই উঠুক। কিন্তু গণেশ হালদারের আপত্তির ফলে তা সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে নীলাম্বরবাবু সার্কিট হাউসের দোতলার দু'খানা ঘর ওদের জন্য ঠিক করে দিয়েছেন। আজ সকালে জিৎ আর বুড়ি নীচে সার্কিট হাউসের বাগানে বেড়ানোর সময় সাপটাকে দেখতে পেল। সাপটা বাগানের রাস্তার ওপর ফণা তুলে ফুঁসছে।

সার্কিট হাউসের চৌহদ্দিটা বড়ো। মূল বিল্ডিং ঘিরে ফল-ফুল শাক-সব্জির বাগান। বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ি বিছানো রাস্তা। এই রাস্তাটাই মূল বিল্ডিংকে বেড় দিয়ে এসেছে। ফটক দিয়ে ঢুকতেই বাঁ-হাতে পাঁচিল ঘেঁষে চৌকিদার আর মালির ঘর।

বুড়ির মুখে 'কেউটে কেউটে' চিৎকার শুনেই তারা ছুটে এল। গণেশ হালদার নিজের ঘরে বসে যোগব্যায়াম করছিল। চিৎকার শুনে সেও ছুটে এল। সাপটা তখনও বীরের মতন ফণা দুলিয়ে চলেছে।

চৌকিদার বলল, 'আমি এখানে বত্রিশ বছর চাকরি করছি, কখনো তো সাপ-টাপ দেখিনি।' বলেই সে তার ঘর থেকে একটা লম্বা লাঠি নিয়ে এল।

মালি বলল, 'ঝড়ুদা, তুমি একা পারবে না। একটু দাঁড়াও, আমিও একটা লাঠি নিয়ে আসছি।'

এরই মধ্যে সাপটা ফণা গুটিয়ে পশ্চিমদিকে পাঁচিলের ধারে চলে গেল। চৌকিদার আর মালি দুজনে লাঠি হাতে এগোল সাপটাকে মারার জন্য।

'আরে মশাই, করছেন কি আপনারা? হল্লা কিসের?' বলতে বলতে একতলার একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক সর্দারজি। চোখে কালো চশমা। সার্কিট হাউসের রেজিস্টারে সই করেছেন তেজ সিং নামে।

গণেশ হালদার তাঁকে বলল, 'ও-দিকে যাবেন না। নাগমেধ যজ্ঞ হচ্ছে।'

BanglaBook.org

'নাগমেধ!' চমকে উঠলেন সর্দারজি। 'কী বলছেন! আপনার কথার মানে বুঝতে পারলাম না।'

'এখুনি বুঝতে পারবেন। একটু অপেক্ষা করুন।' বলেই গণেশ হালদার নস্যি টানতে শুরু করল। তারপর সর্দারজির দিকে তেরছা চোখে তাকিয়ে বলল, 'বাংলা তো দেখছি ভালোই বলেন, বুঝতে পারেন না?'

সর্দারজি আর একবার চমকে উঠলেন। গণেশ হালদারের চোখে তা ধরা পড়ল।

ও-দিকে চৌকিদার আর মালি দুজনে মিলে সাপটাকে পেটাতে শুরু করেছে। জিৎ আর বুড়ি ভয়ে-আনন্দে চিৎকার করছে।

গণেশ হালদার সর্দারজিকে বলল, 'নাগ মানে সাপ, আর মেধ হচ্ছে যজ্ঞ। আবার যজ্ঞকে কেউ বলে যাগ, কেউ বলে ক্রিয়াকর্ম। চুরি, চোরাচালান, গ্রেফতার, বিচার, জেল, ফাঁসি, জেল-পালানো, খুন, সবই ক্রিয়াকর্মের মধ্যে পড়ে। ও কী, চলে যাচ্ছেন কেন? সাপ-যজ্ঞ দেখে যাবেন না?'

সর্দারজি কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। এদিকে সাপটাও মারা পড়েছে। চৌকিদারের লাঠির ঘায়ে সাপটার মাথা থেঁতলে যেতেই মালি বাকি কাজটাও শেষ করে ফেলল। তারপর সেটাকে গেটের বাইরে নিয়ে গিয়ে খড়কুটো জোগাড় করে পুড়িয়ে ফেলল।

জিৎ একটা ঝাঁকড়া গোলাপ-গাছের পেছন দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'কাকু, ঝুড়ির মতন কী যেন একটা পড়ে রয়েছে ওখানে।'

'আরে, এটা তো একটা ঝাঁপি!' বলতে বলতে গণেশ হালদার গোলাপ-ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

বুড়ি-জিতের পোষা বাঁদর সুন্দর এতক্ষণ দোতলার বারান্দায় বসে সিঙ্গাপুরি কলা খাচ্ছিল। সাপের ব্যাপারে সে কোনও কৌতূহল দেখায়নি। কিন্তু জিৎ যখন ঝাঁপিটা আবিষ্কার করল, সুন্দরের তখন খাওয়া শেষ হয়েছে। এক লাফে ও রেলিং-এ উঠে পড়ল। তারপর আর-এক লাফে নেমে পড়ল মাটিতে, বুড়ির পেছনে।

'কে রে?' বুড়ি চমকে দু'পা সরে গেল। তারপর পেছন ফিরে সুন্দরকে দেখতে পেয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে দুটো চাঁটি মেরে বলল, 'দুষ্টু কোথাকার!'

এর মধ্যে চৌকিদার আর মালিও এগিয়ে এসেছে। তারাও ঝাঁপিটাকে দেখতে পেয়েছে। মালি ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে বলল, 'এটা তো দেখছি সাপুড়েদের সাপ রাখার ঝাঁপি। এখানে এল কী করে?'

গণেশ হালদার বলল, 'তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, সাপটাকে কেউ একজন এই ঝাঁপিতে ভরে নিয়ে এসেছিল।'

BanglaBook.org

চৌকিদার বলল, 'বাইরের কাউকে তো ভেতরে ঢুকতে দেখিনি।'

মালি বলল, 'আমিও দেখিনি।'

'তা হলে অবশ্যই ভেতরের কেউ। কে সেই লোক?'

'এ তো সর্বনাশের কথা! কেউ এনে থাকলে বদ মতলবেই এনেছিল। হয়তো কারোর ঘরে রাতের অন্ধকারে সাপটাকে সে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। তাই সন্ধের সময় ঝাঁপিটাকে এনে এই গোলাপ-গাছটার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কেননা, তার আগেই সাপটা ঝাঁপির ডালা মাথা দিয়ে ঠেলে খুলে বেরিয়ে পড়েছিল।' মালি অনুমানের সাহায্যে বলল।

'কিন্তু কে এনেছিল? আর কার ঘরেই বা সে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল?' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে গণেশ হালদার সার্কিট হাউসের বারান্দায় নজর ফেরাল।

চৌকিদার বলল, 'সেটা স্যার পুলিশ এসে খুঁজুক। আমি এখুনি একটা ফোন করে দিচ্ছি থানায়।'

গণেশ হালদার বলল, 'না থাক, আমিই করছি। আপনি বরং গেটটা বন্ধ করে রাখুন আর থানা থেকে পুলিশ না আসা পর্যন্ত কাউকে বেরোতেও দেবেন না, ঢুকতেও দেবেন না।' বলেই সে অফিসঘরের দিকে চলে গেল।

চৌকিদার গেট বন্ধ করে দিল। এর পরেই বিপত্তিটা বাধল। সর্দারজি অ্যাটাচি হাতে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তিনি বাইরে যেতে চান। চৌকিদার বলল, 'এখন কোথাও যেতে পারবেন না। আগে থানা থেকে পুলিশ আসুক। তারা যদি যেতে বলে, যাবেন।'

'থানা-পুলিশ কেন?' সর্দারজি জানতে চাইলেন।

চৌকিদার বলল, 'কেউ একজন ঝাঁপিতে করে এখানে সাপ নিয়ে এসেছিল। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

সর্দারজি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কোথায় খুঁজবে? সে কি তোমাদের হাতে ধরা পড়ার জন্যে এখানে ঘুমোচ্ছে?' বলেই তিনি গেটের দিকে এগোলেন।

মালি এগিয়ে এল চৌকিদারের সাহায্যে। সে সর্দারজিকে বাধা দিয়ে বলল, 'দয়া করে এখন যাবেন না।'

চৌকিদার বলল, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনাকে আমরা যেতে দেব না।' বলেই সে সর্দারজির পথ আগলে দাঁড়াল।

'ব্যাটা তেলাপোকার বাচ্চা, আমি তোকে জুতোর তলায় চিপসে মারব।' বলেই সর্দারজি চৌকিদারকে একটা ধাক্কা মারলেন।

চৌকিদার ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। সর্দারজি অমনই চিত হয়ে পড়ে থাকা চৌকিদারের বুকের ওপর পা রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর কে আমাকে বাধা দিতে চাস? এগিয়ে আয়।'

BanglaBook.org

দেখি তোকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারি কি না।

মালি এগিয়ে এসে লাঠি ওঠাতেই সর্দারজি মাথা নিচু করে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় লাঠিটা ধরে ফেললেন। তারপর একটা হ্যাঁচকা টানে সেটা কেড়ে নিয়ে মালির মাথাতেই একটা বাড়ি বসালেন। তবে বাড়িটা তার মাথায় না লেগে বাঁদিকের কাঁধে লাগল। মালিও মাটিতে পড়ে গেল। এবার জিৎ আর বুড়ি এগিয়ে এল। সর্দারজি বললেন, 'তোরাও লড়বি না কি?'

সর্দারজি 'তুই' বলাতে জিৎ মাথা ঠিক রাখতে পারল না। লাফিয়ে উঠে সর্দারজির নাকে একটা ঘুঁষি মারল। সর্দারজি সম্ভবত ভাবতে পারেননি একটা বাচ্চা ছেলে তাঁকে মারতে পারে। তাই তিনি সাবধান হবার চেষ্টাই করেননি। মার খেয়ে তিনি এবার জিৎকে ধরার জন্য এগিয়ে এলেন।

চৌকিদার এই সুযোগটাই কাজে লাগাল। সে সর্দারজিকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জিৎ আর বুড়ি এসে সর্দারজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরা দুজনে মিলে সর্দারজিকে কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল। সর্দারজি তারই মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বুড়িকে দু'হাতে মাটি থেকে তুলে নিয়েই চৌকিদারের নাগাল এড়িয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

বুড়ি চেঁচাতে লাগল 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে। জিৎ ছুটল সর্দারজির পিছনে। মালি আর চৌকিদারও ছুটল। গণেশ হালদার ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই সুন্দর কয়েকটা লাফ মেরে সর্দারজির কাছে চলে গেল। তারপর আর এক লাফে তাঁর কাঁধে উঠে পড়ল। সর্দারজি এক হাত দিয়ে অ্যাটাচি, অন্য হাত দিয়ে বুড়িকে ধরে আছেন। তিনি সুন্দরকে বাধা দিতে পারলেন না। সুন্দর তাঁর কাঁধে উঠেই পাগড়ি ধরে টান মারল। পাগড়ি খুলে বেরিয়ে পড়ল চকচকে টাক আর লোমশ দুটো কান। সুন্দর এবার তাঁর দাড়ি ধরে টান মারতে সেটাও খুলে এল। চোখে কালো চশমাটা থাকলেও অবশ্য লোকটাকে চিনতে জিৎ-বুড়ির আর অসুবিধে হল না। এ-ই সেই লোক, যার সঙ্গে কোচবিহারের 'অলকা' হোটেলে প্রফেসর কল্লোল বিশ্বাসের হাতাহাতি হয়েছিল। লোকটা নিজের বিপদ বুঝতে পেরে বুড়িকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কেবল অ্যাটাচিটা নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

চৌকিদার আর মালি লোকটাকে তাড়া করার জন্য দৌড় শুরু করতেই গণেশ হালদার তাদের থামানোর জন্য বলল, 'ওকে যেতে দিন। অনর্থক ছোটার দরকার নেই। পারলে পুলিশ ওকে ধরবে।' এই বলে মাটি থেকে একটা জিনিস ও কুড়িয়ে নিল।

জিনিসটা একটা মানিব্যাগ। ধস্তাধস্তির সময় লোমশ কান লোকটার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। সেটা খুলে তার মধ্যে কিছু টাকার সঙ্গে আবিষ্কার করল দুটো চিরকুট।

প্রথমটায় লেখা রয়েছে 'যদি বাঁচতে চাস, দিনহাটার সার্কিট হাউসে গিয়ে গণেশ হালদারকে খতম কর। যদি বলে না পারিস, ছলে মার। বেদেদের কাছ

BanglaBook.org

থেকে একটা গোখরো সাপ কিনে নিয়ে সেটাকে রাত্তিরবেলা গণেশ হালদারের ঘরে ছেড়ে দো' তারপর সইয়ের জায়গায় ত্রিশূলের ছবি।

দ্বিতীয় কাগজটায় লেখা 'লক্ষ্মীবারে নিশিকালে নিশাকর উঠলে মাথায় জলটুঙির ঈশানে নিশাচরের পাবে নিশানা। তুমি না, যাবে অন্য লোক। তাকে পাঠাও। তুমি নজর রাখো দারোগার ওপর। আরেকটা কথা। ত্রিশূলকে খুঁজে বার কর। আড়ালে থেকে সে কেবল হুকুম করবে, আর হুকুম না মানলে হুমকি দেবে, এ-সব অসহ্য। তার হদিস আমার চাই। নাগরাজ।'

॥ দশ ॥

নাগরাজের গুহায়

বিষ্যুদবার, ১৯ অক্টোবর। বিকেল ৫টা।

দিনহাটা থেকে ওরা প্রথমে এল আকালপুর। সেখানে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে জিৎ আর বুড়ি খেল গরম দুধ। দিনহাটা থানার বড়োবাবু নীলাম্বর মজুমদার আর গণেশ হালদার চা নিলেন।

নীলাম্বরবাবুর পরনে সাধারণ পোশাক, সঙ্গে কোনও কনস্টেবল নেই। এমন কি উনি যে-গাড়িটায় চড়ে এসেছেন, সেটাও একটা ভাড়া করা প্রাইভেট কার। উনি নিজেই ড্রাইভ করছেন। সবই গণেশ হালদারের পরামর্শেই।

লোমশ কান লোকটার মানিব্যাগ থেকে পাওয়া নাগরাজের লেখা চিরকুটের রহস্য গতকালই গণেশ হালদার ভেদ করেছিল। জলটুঙির মালিক-কাম-ম্যানেজার বলহরি তালুকদারকে যদি বলা হয় চোর, তাহলে এই নাগরাজকে বলতে হয় বাটপাড়, যার অবস্থান সব সময় চোরের ওপরে থাকে। এটা ছিল নীলাম্বরবাবুর ব্যাখ্যা। কিন্তু গণেশ হালদার এটা মানতে পারেনি।

গণেশ হালদারের মতে এই নাগরাজ লোকটা হচ্ছে বলহরির একজন খদ্দের। নিশাচর হচ্ছে বলহরির লোক। লোমশ কান লোকটা নাগরাজের দলের। সে এই নাগরাজের দলেরই অন্য একটা লোককে জলটুঙির ঈশান কোণে পাঠাবে। সেই লোকটা আর নিশাচর, দুজনে দু'জায়গা থেকে এসে জলটুঙির উত্তর-পূর্ব কোণে বিষ্যুদবারের রাত্তিরে চাঁদ যখন মাথার ওপর উঠবে, তখন মিলিত হবে।

নীলাম্বরবাবু বলেছিলেন, 'তোমার ব্যাখ্যাটাই হয়তো ঠিক। সে যাই হোক, আমরা আসছে কাল জলটুঙিতে লোকদুটোকে পাকড়াও করছি। আর ঈশান-কোণে নিশাচরের নিশানা আমাদের পেতেই হবে।'

চা খাওয়া হয়ে গেলে নীলাম্বরবাবুই দাম মিটিয়ে দিলেন। দোকানদার বা অন্য খদ্দেররা যে ওঁকে চিনতে পারলেন না সেটা দোকানদারের কথা থেকেই বোঝা গেল। তিনি বললেন, 'আপনারা বুঝি মা-কালীর মন্দিরে যাচ্ছেন?'

BanglaBook.org

গণেশ হালদার বলল, 'মা-কালীর মন্দির? সেটা কোথায়?'

'এই পথে, দক্ষিণে। হরিহরপুর যেতে গেলে ডানহাতে পড়বে জলটুঙি। তার আগেই পড়বে ধরলা নদীর বাঁক। সেই বাঁকের মুখেই আছে মা-কালীর মন্দির আর কপালীবাবার আশ্রম।' দোকানদার জানালেন।

'কপালীবাবা কে?' গণেশ হালদারের প্রশ্ন।

'এক সাধু। মন্দিরে পুজো করেন।' একটু থেমে দোকানদার ফের বললেন, 'আগে মন্দিরটা বনের মধ্যে পড়ো অবস্থায় ছিল। সেখানে মূর্তি ছিল না। কপালীবাবা এসে সেখানে মা-কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আশ্রমটাও বানিয়েছেন।'

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'তা হলে তো একবার দেখতে হয়।'

'তাড়াতাড়ি যান। চারটের সময় আশ্রমের গেট বন্ধ হয়ে যায়।' দোকানদার বললেন।

নীলাম্বরবাবু ঘড়ি দেখলেন। চারটে বাজতে মিনিট দুয়েক বাকি। উনি বললেন, 'আজ তাহলে কালী-দর্শন আমাদের ভাগ্যে নেই।' বলে উনি গাড়ির দিকে এগোলেন।

জিৎ, বুড়ি আর সুন্দরকে নিয়ে গণেশ হালদারও গাড়িতে উঠে পড়ল।

ধরলা নদীকে ডান হাতে রেখে গাড়ি দক্ষিণমুখে এগিয়ে চলল। বাঁ হাতে মাঠ আর বন। বসতির চিহ্ন নেই। জিৎ আর বুড়ি প্রবল কৌতূল নিয়ে দু'পাশের দৃশ্য দেখছে।

অবশেষে এসে গেল ধরলা নদীর সেই বাঁক, যার মুখে একটা উঁচু ঢিবির ওপর কপালীবাবার আশ্রমটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাকা রাস্তা থেকে গেটের মুখ পর্যন্ত ক্রমশ উঁচু হয়ে চলে গিয়েছে প্রায় চার মিটার চওড়া মোরাম ফেলা একটা পথ। এর দৈর্ঘ্য প্রায় একশো মিটার।

নীলাম্বরবাবু গাড়িটাকে আশ্রমের রাস্তায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেটের সামনে এসে থামালেন। গেট বন্ধ। উনি ঘড়ি দেখলেন। এখন সময় সোওয়া চারটে। পনেরো মিনিট দেরি হয়েছে।

গণেশ হালদার গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ওর দেখাদেখি বুড়ি, জিৎ আর সুন্দরও নেমে পড়ল। সুন্দরের গলায় লকেটের মতন ঝুলছে একটা টেপ-রেকর্ডার।

নীলাম্বরবাবু গাড়ি থেকে না নেমে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর গণেশ হালদারকে বললেন, 'আমি আর নামলাম না। তোমরা আশ্রমটার চারধারে একটা রাউন্ড দিয়ে এসো।'

গেটের ভেতরেও একটা মোরাম ফেলা রাস্তা। ক্রমশ উঁচু হয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। পাঁচ-চুড়ো মন্দির। তার পেছন দিকে দু'তিন-খানা পাকা

BanglaBook.org

ঘর। গেটের বাইরে থেকেই সেগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে দুটো অশথ গাছ। তা ছাড়া অন্য গাছ-গাছালি আর ফুলের বাগান তো আছেই।

আশ্রমটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন নীলাম্বরবাবু। কিন্তু ওদিকে কোনও লোকজন ওঁর চোখে পড়ল না। নিজের কাছেপিঠে ওঁর লক্ষ ছিল না। হঠাৎ উনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কেউ একজন ক্লোরোফর্ম মাখানো একটা রুমাল ওঁর নাকে চেপে ধরল। অমনই উনি প্রতিরোধের শক্তি আর জ্ঞান দুই-ই হারালেন।

আক্রমণকারীর মুখ ঢাকা ছিল মুখোশে। নীলাম্বরবাবু জ্ঞান হারাতেই মুখোশধারী তাঁকে ড্রাইভারের সিটের পাশে শুইয়ে দিয়ে নিজে তাঁর জায়গায় বসে গাড়িটাকে পিছিয়ে নিয়ে গেল বড়ো রাস্তায়। তারপর প্রচণ্ড স্পিডে সেটাকে দক্ষিণমুখে চালিয়ে দিল। তার আগেই সে নীলাম্বরবাবুর হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। ওঁর মুখটাও বেঁধে দিয়েছিল একটা ন্যাকড়া দিয়ে, যাতে উনি চেঁচাতে না পারেন।

নীলাম্বরবাবুর যখন জ্ঞান ফিরল, তখনও উনি গাড়ির ভেতর হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে। না পারছেন পাশ ফিরতে, না পারছেন কথা বলতে। এতদিন উনি পুলিশের চাকরি করছেন, এর মধ্যে কোনোদিনও লড়াই না করেই শত্রুর কাছে নিজেকে সঁপে দেননি, এরকম অসহায় অবস্থার মধ্যেও ওঁকে কোনোদিন পড়তে হয়নি।

চাঁদের আলো-ঝরা রাত। দু'পাশের গাছ-গাছালি ভূত-পেত্নীর চেহারায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দু'চারটে রাত-চরা পাখি মাঝে মাঝে চেরা গলায় ছিৎকার করছে। শিয়ালের হুক্কাহুয়া হাঁক ভেসে আসছে দূর থেকে। অবিশ্যি কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ পরে গাড়িটা একটা বিশাল ঢিবির পাশে এসে থামল। এরকম নিঃশব্দ-নির্জন জায়গার কথা লোকালয়ে বসে কল্পনা করা কঠিন। কোথাও কোনও দিকে জনমানুষের সাড়া নেই। জায়গাটা কোথায় হতে পারে, নীলাম্বরবাবু বুঝতে পারলেন না।

গাড়ি থামিয়ে আক্রমণকারী একবার কোকিলের ডাক ডেকে উঠল। অমনি গাড়ির দু'পাশে দুটো ছায়ামূর্তি উপস্থিত হল। আক্রমণকারী আদেশের সুরে তাদের বলল, 'এই লোকটাকে চোখ বেঁধে তিন নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।'

ছায়ামূর্তিরা নীলাম্বরবাবুর চোখে কাপড় বেঁধে চ্যাংদোলা করে ঢিবিটার মধ্যে অবস্থিত একটা ঘরে নিয়ে এল। একটা খাটের ওপর শুইয়ে দিয়ে সব বাঁধন খুলে দিল।

নীলাম্বরবাবু চোখ খুলে দেখলেন সাজানো-গোছানো হোটেল-ঘরের মতন একটা ঘরে ওঁকে আনা হয়েছে। বৈদ্যুতিক পাখা আর আলোও রয়েছে। উনি

BanglaBook.org

শুয়ে রয়েছেন একটা গদি-মোড়া খাটে।

'আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এলে?' লোকদুটোকে নীলাম্বরবাবু শুধোলেন। কিন্তু তারা কোনও জবাব দেওয়ার আগেই একটা প্রকাণ্ড চেহারার লোক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'নাগরাজের গুহায়।' লোকটার কথাগুলো বাংলা হলেও অবাঙালি টান আছে।

নীলাম্বরবাবু তাকিয়ে দেখলেন লোকটার মাথায় পরা রয়েছে কালো রঙের একটা টুপি। সেটার সামনের দিকে আঁটা রয়েছে একটা স্টিকার। স্টিকারটায় আঁকা একটা গোখরো সাপের ফণা।

না, নীলাম্বরবাবু লোকটাকে আগে কখনও দেখেননি।

॥ এগারো ॥

নিশাচরের নিশানা

মন্দির সমেত আশ্রমের চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে গেটের সামনে ফিরে এসে গণেশ হালদাররা দেখল নীলাম্বরবাবুর গাড়িটা সেখানে নেই।

বুড়ি শুধোল, 'নীলাম্বরকাকু গাড়ি নিয়ে কোথায় গেলেন?'

জিৎ হাল্কা সুরে বলল, 'রহস্যের সন্ধানে।'

গণেশ হালদার বলল, 'খুব চিন্তার কথা। চলো, বড়ো রাস্তার দিকে যাওয়া যাক।'

বড়ো রাস্তায় উঠে এসেও কিন্তু গাড়ি তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্যন্ত দেখা গেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ধরলা নদীর জলে সিঁদুর-লাল ছোঁয়া। পাখিরা দল বেঁধে বাসায় ফিরছে। পাশের বন থেকে রাস্তার ওপর উঠে এসে একটা দলছুট শিয়াল অবাক-চোখে গণেশ হালদারদের দেখছিল। হঠাৎ শিয়ালটাকে দেখতে পেয়েই বুড়ি ভয়ে গণেশ হালদারের কোমর জড়িয়ে ধরল।

গণেশ হালদার ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ও কিছু বলবে না। সুস্থ শিয়াল মানুষকে কিছু বলে না। তবে পাগলা শিয়ালের কথা আলাদা।'

গণেশ হালদারের কথা শেষ হতেই জিৎ দু'হাতের পাতা মুখের ওপর জোড় করে হেঁকে উঠল, 'হু-ক্কা হু-য়া।' সুন্দরও সাহস পেয়ে শিয়ালটার দিকে একটু ছুটে গেল। শিয়ালটা কিন্তু ভয় পেল না। সে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই রইল। জিৎ আবার 'হু-ক্কা হু-য়া' বলে হেঁকে উঠল। এবার বুড়িও সাহস পেয়ে 'হু-ক্কা হু-য়া' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ওরা সবাই খুব মজা পেয়ে গেছে। শিয়ালটার কাছে কিন্তু এ-সব বিদ্রূপ অসহ্য হয়ে উঠল। সে তাই চুপচাপ সরে পড়ল পাশের জঙ্গলে। বুড়ি অমনই গণেশ হালদারের কোমর ছেড়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল।

BanglaBook.org

এমন সময় দেখা গেল একটা মোটরগাড়ি দিনহাটার দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। গণেশ হালদাররা রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। গাড়িটা একটুও স্পিড না কমিয়ে জলটুঙির দিকে বেরিয়ে গেল। না, এতে নীলাম্বরবাবু নেই। এটা সেই গাড়িও নয়। এ গাড়ির সওয়ারি মোট চারজন।

গণেশ হালদার বলল, 'আর দেরি করে লাভ নেই। জলটুঙির দিকে এগোনো যাক। নীলাম্বর নিশ্চয়ই কোনো ঝমেলায় পড়েছে।' এই বলে ও পরপর দু'টিপ নস্যি টানল। তারপর রুমাল দিয়ে নাক মুছে দক্ষিণ দিকে পা বাড়াল।

সূর্য ডুবতেই দ্বাদশীর চাঁদ আকাশের পুব গায়ে প্রকাশ পেল। আর কয়েকটা দিন পরেই পূর্ণিমা। পথ চলার পক্ষে চাঁদের কাছ থেকে যে-টুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে, সে-টুকুই অনেক। তা না হলে এই অজানা-অচেনা পথে খুবই মুশকিল হত।

চাঁদকে বাঁ-হাতে আর ধরলা নদীকে ডান-হাতে রেখে ওরা এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। সুন্দর চলল সবার আগে আগে। ওর গলায় লকেটের মতন ঝুলছে ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারটা। ওটা চালানোর আর বন্ধ করার কৌশল সুন্দরের ভালোই রপ্ত আছে।

বুড়ি বলল, 'কাকু, গাড়িতে কারা গেল?'

গণেশ হালদার বলল, 'আমিও তো সে-কথাই ভাবছি, মা-মণি। আরো ভাবছি, নীলাম্বর গেল কোথায়?'

জিৎ বলল, 'বিপদে পড়লে নিশ্চয়ই হর্ন বাজিয়ে আমাদের ডাকতেন। আমার মনে হয় উনি কারও পিছু নিয়েছেন।'

'হতেও পারে। কিন্তু তাতেও সে বিপদে পড়তে পারে।' একটু থেমে গণেশ হালদার সামনের দিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'আরে, আমরা তো প্রায় এসে গিয়েছি। ওই তো সামনেই জলাটা দেখা যাচ্ছে। তার মাঝখানে জাহাজের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছে জলটুঙিটা।'

বুড়ি শুধোল, 'কাকু, এখানে জলাটা সৃষ্টি হল কী করে?'

'ভূগোলে তোমরা নিশ্চয়ই অশ্বক্ষুরাকৃতি-হ্রদের কথা পড়েছ। এই জলাটাও সেইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আগে ধরলা নদীর একটা বাঁক ছিল এখানে। এখন নদীটা একটু তফাতে সরে গিয়েছে।' একটু থেমে গরেশ হালদার ফের বলল, 'ভালো কথা, আমরা কিন্তু আর এগোব না। এখন আমরা জলটুঙির যে-দিকটায় রয়েছি, এটাকেই বলে ঈশান-কোণ। তবে চাঁদ মাথার ওপর আসতে এখনো প্রায় আধঘণ্টা দেরি। চলো, রাস্তা থেকে নেমে ওই ঝোপটার আড়ালে বসা যাক।'

প্রায় আধঘণ্টা পরে চাঁদটা মাথার ওপর এল। অমনই দেখা গেল ওদের সামনেই জলাটার ধারে একটা ছায়ামূর্তি রাস্তার দিক থেকে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে একটা অ্যাটাচি, মাথায় টুপি। গায়ে আলখাল্লা জাতীয় ঢোলা জামা।

BanglaBook.org

লোকটা পকেট থেকে একটা চুরুট বের করল। তারপর লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরানোর চেষ্টা করল। গণেশ হালদার লক্ষ করল মোট চারবারের চেষ্টায় চুরুটটা সে ধরাল।

একটু পরেই আর-একটা ছায়ামূর্তি সেখানে উপস্থিত হল। তারও হাতে অ্যাটাচি, মাথায় টুপি, গায়ে আলখাল্লা জাতীয় পোশাক। এই দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিটা এসেই দু'বার গলা খাঁকারি দিয়ে প্রথম ছায়ামূর্তিকে শুধোল, 'দাদা, দেশলাই হবে?'

প্রথম ছায়ামূর্তি পকেট থেকে লাইটার বার করে সেটা জ্বেলে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির দিকে বাড়িয়ে ধরল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি তাতে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রথম ছায়ামূর্তির সঙ্গে অ্যাটাচি বদল করল।

অমনই গণেশ হালদার সিংহের গলায় বলে উঠল, 'হ্যান্ডস আপ! সাবধান, যে যেমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছো, তেমনি থাকবে। চালাকি করার চেষ্টা করলেই গুলি মেরে দুজনের বডিই ফুটো করে দেব।' বলতে বলতে রিভলভার হাতে ছায়ামূর্তিদের দিকে এগিয়ে গেল গণেশ হালদার। জিৎ, বুড়ি আর সুন্দরও ওর সঙ্গে এগিয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি দুটো দাঁড়িয়ে ছিল জলাটার একেবারে ধারে।

গণেশ হালদার বলল, 'আমি এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যেই তোমরা তোমাদের অ্যাটাচি দুটো মাটিতে ফেলে দেবে। নইলে গুলি করতে বাধ্য হব। এক—দুই—তিন।'

গণেশ হালদারের মুখ থেকে 'তিন' বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি দুজন তাদের অ্যাটাচি দুটো এমন ভাবে পেছনে ছুঁড়ে মারল যার একটা এসে লাগল গণেশ হালদারের রিভলভার ধরা হাতে, অন্যটা এসে লাগল ওর কপালে। গণেশ হালদারের হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। ও নিজেও টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। অমনই ছায়ামূর্তি দুটো ঘুরে এসে অ্যাটাচি দুটো কুড়িয়ে নিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জিৎ, বুড়ি আর সুন্দর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। গণেশ হালদারও উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু ওর কপাল কেটে রক্ত বেরোচ্ছিল গলগল করে। মাথাটাও টলছিল খুব।

ছায়ামূর্তিদের একজন মাটিতে পড়ে থাকা রিভলভারটার দিকে এগিয়ে যেতেই গণেশ হালদার তার মুখে একটা ঘুঁষি মারল। ঘুঁষিটা জুতসই হল না। লোকটা পাল্টা ঘুঁষি চালাল। গণেশ হালদার সেটা এড়াতে পারল না। মাটিতে পড়ে গিয়ে এবার ও জ্ঞান হারাল।

এরপর লড়াইটা হল প্রায় একতরফা। অনেক চেষ্টা করেও জিৎ বা বুড়ি সুবিধে করতে পারল না। সুন্দরের আঁচড়-কামড়েও ছায়ামূর্তি দুটো কাবু হল না। বরং আরও ক্ষেপে উঠল। তারা টর্চের আলোয় অ্যাটাচি দুটো খুঁজে নিল, তারপর জিৎ আর বুড়িকে জোর করে ধরে নিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। সুন্দর

BanglaBook.org

ওদের পিছু নিল। ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারটা একই ভাবে ওর গলায় ঝুলছে।

একটু পরেই দক্ষিণ দিক থেকে একটা মোটরগাড়ি এসে তাদের সামনে থামল। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিটা জিৎ আর বুড়িকে তার মধ্যে জোর করে তুলতে গেলে জিৎ-বুড়ি বাধা দিল। কিন্তু গায়ের জোরে পারল না। কাজেই ওদের উঠতেই হল। গাড়িটা ছেড়ে দিতেই তার চালের ওপর লাফ মেরে উঠে পড়ল সুন্দর।

আরোহীরা কেউই সুন্দরকে লক্ষ করেনি। গাড়ি ছাড়ার আগেই প্রথম ছায়ামূর্তি জলটুঙির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। কাজেই সে-ও সুন্দরকে দেখতে পায়নি।

জিৎ আর বুড়ির বুঝতে বাকি নেই, প্রথম ছায়ামূর্তির নামই হচ্ছে নিশাচর। আর তার নিশানা বা উপস্থিতির সংকেত ছিল চুরুট ধরানোর ছলে চারবার লাইটার জ্বালানো। ওরা এটাও বুঝতে পারল, দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে নাগরাজের গুহায়। আর কি কোনোদিন সেই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ওরা?

॥ বারো ॥

গণেশ হালদারের জ্ঞান ফিরল

ঠান্ডা জলো হাওয়ায় আধঘণ্টার মধ্যে গণেশ হালদারের জ্ঞান ফিরে এলেও যন্ত্রণায় ও মাথা তুলতে পারল না। খানিকটা সুস্থ বোধ করল প্রায় দু'ঘণ্টা পর। চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। কিছুক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থেকে ও ভাববার চেষ্টা করল এখন কোথায় আছে। ধীরে ধীরে আগের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। জিৎ-বুড়ি-সুন্দরের কথাও মনে পড়ল।

মনটাকে চাঙা করে গণেশ হালদার উঠে বসল। পকেট থেকে টর্চ বের করে ঘড়ি দেখল—তিনটে দশ। ও বুঝে নিল শত্রুরা জিৎ-বুড়িকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে। তা নইলে তারা এ-সময় ওর কাছে থাকত। তবুও ও উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খুঁজে দেখল। বলা তো যায় না, হয়তো তারাও শত্রুর হাতে মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর গণেশ হালদার জলটুঙির দিকে চোখ রাখল। চাঁদের আলোয় ভূতুড়ে বাড়ির মতন দেখাচ্ছে। ভেতরে বা বাইরে কোথাও আলো জ্বালা নেই। জিৎ-বুড়িকে শত্রুরা ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখল না তো?

জলটুঙির গেটের কাছে এসে গণেশ হালদার দেখল, সেটা ভেজানো রয়েছে। নিঃশব্দে গেটটা ও পার হল। তারপর একটা ভাসমান সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছল মূল বাড়িটার লোহার দরোজার সামনে। প্রকাণ্ড দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

BanglaBook.org

গণেশ হালদার সময় নষ্ট করল না। রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে দোতলার জানলার ধারে উঠে এল। জানলায় গরাদ নেই। পাল্লা দুটোও খোলা। জানলা দিয়ে ও ভেতরে ঢুকে গেল। টর্চের ঝলকে দেখল দুটো মেয়ে একটা বড়ো খাটের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বিড়ালের মতন পা ফেলে ও দরোজার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু ছিটকিনি খুলতে গিয়ে শব্দ হয়ে গেল একটু।

ছিটকিনি খোলার শব্দে রিংকির ঘুম ভেঙে যেতেই ও দিদিকে কনুই দিয়ে ঠেলা দিল। পিংকি বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'এই, কি হচ্ছে? ঘুমো।'

রিংকি আর-একবার ঠেলা দিতেই পিংকি বুঝে নিল কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। বালিশের পাশ থেকে টর্চ হাতে নিয়ে পিংকি বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর ঘরের এদিক-ওদিকে আলো ফেলতে ফেলতে গণেশ হালদারকে ও দেখতে পেল। বিস্ময়ে আতঙ্কে ও বলে উঠল, 'কে?'

গণেশ হালদার বলল, 'আমি গোয়েন্দা। আমার নাম গণেশ হালদার।'

'গোয়েন্দা গণেশ হালদার! আপনি! বিশ্বাস করতে পারছি নে। গণেশ হালদার তো কলকাতায় থাকে।'

'আমিই সেই গণেশ হালদার। দিনহাটা থানার বড়োবাবু জলটুঙির রহস্য ভেদ করার জন্য আমাকে ডেকে এনেছেন। তোমার নামই তো পিংকি, আর তোমার বোনের নাম তো রিংকি? এগারোই অক্টোবর তুমি থানায় গিয়ে যে স্টেটমেন্ট দিয়ে এসেছ, তা আমি পড়েছি।'

পিংকি গণেশ হালদারের কথা অবিশ্বাস করল না। বলল, 'আপনি এখানে এলেন কী করে?'

'রেন-পাইপ বেয়ে। যাক গে, আমি যে-জন্যে এখানে এলাম, তা শোনো। প্রায় তোমাদের বয়েসী আমার দুজন খুদে সঙ্গী আছে, জানো তো?'

'জানি। তাদের নাম জিৎ আর বুড়ি। আরো একজন বাঁদর সঙ্গী আছে। তার নাম সুন্দর। আপনার কেস-হিস্ট্রি নিয়ে লেখা যে-সব বই বেরিয়েছে, তাতে পড়েছি। আমি গোয়েন্দা-গল্প খুব ভালোবাসি। তবে সত্যিকারের একজন গোয়েন্দাকে আজই প্রথম চোখে দেখছি। এই রিংকি, উঠে বস। গণেশকাকুকে বসতে দে। আমরা কিন্তু আপনাকে কাকু বলব। আপত্তি নেই তো?' বলল পিংকি।

'একটুও না। কিন্তু আমার হাতে আজ সময় নেই।' গণেশ হালদার বলতে লাগল। 'আমি যে-জন্যে এসেছি, শোনো। আজ মাঝ-রাত্তিরে জলটুঙির উত্তর-পুব কোণে দুজন স্মাগলারকে ধরতে এসেছিলাম। সে-সময় আমার আত্মতুষ্টির ভুলে তারা আমাকে হারিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গীদের কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়। তাদের এখানে এনে আটকে রাখা হয়েছে কি না, তোমরা কি জানো?'

'তা তো বলতে পারব না। স্মাগলারদের নাম জানেন?' পিংকি শুধোল।

BanglaBook.org

গণেশ হালদার বলল, 'একজনের নাম নিশাচর। অন্যজনের নাম জানি নে। নাগরাজের লোক বলে তার পরিচয়। নিশাচর বা নাগরাজের নাম শুনেছ?'

পিংকি বলল, 'কই, না তো।'

'জলটুঙিতে কারা কারা আছে জানো?'

'দিনের বেলায় কিছু খদ্দের ছাড়া আর কেউ আসে না। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলা চোরাই মাল পাচারকারীরা আসে। সে-সময় একজন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকও আসে। এই লোকটা পেছন দিকের দরোজা দিয়ে যাতায়াত করে। সামনের দিকটার মতন পেছন দিকটাতেও একটা ব্রিজ আছে। সেটা চলে গিয়েছে জলার পশ্চিম পাড় পর্যন্ত। সেখানে আছে গহন বন। বনের ওপারেই ধরলা নদী।'

'এই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা কে? দেখতে কেমন? তার গলার স্বর কী রকম?'

'লোকটার পরিচয় আমি জানতে পারিনি। লোকটা লম্বা। না-রোগা, না-মোটা। অনেকটা আপনার মতন। তার মুখও কোনো দিন দেখতে পাইনি আর গলার স্বরও শুনিনি। সে বলহরি-দাদুর সঙ্গে ইশারায় কথা বলে। বলহরি-দাদু তাকে খুব মেনে চলেন।' একটু থেমে পিংকি ফের বলল, 'আমার মনে হয় লোকটা বোবা। তবে আরো একটা ব্যাপার আছে।'

'সেটা কী?'

পিংকি বলল, 'লোকটা বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটু যেন বেশি ভর দিয়ে হাঁটে। নদীর কিনারায় বালির ওপর তার জুতোর ছাপ দেখে আমার তাই মনে হয়েছে।'

'এটা খুবই দরকারি তথ্য। পরে কাজে লাগবে।' এরপর গণেশ হালদার ফের বলল, 'শোনো, দুটো কাজের ভার আমি তোমাকে দিচ্ছি। এক-নম্বর, জিৎ-বুড়ি এ-বাড়িতে আছে কি না, তা তোমাকে জানতে হবে। দু'নম্বর, নিশাচর আর নাগরাজের পরিচয় জানার চেষ্টা করতে হবে। এখন তা হলে চলি। গুড নাইট!'

'যদি জানতে পারি, আপনাকে জানাব কী করে?' পিংকি শুধোল।

রিংকি বলল, 'তুই কপালীবাবাকে জানিয়ে আসবি। উনি পরে গণেশকাকুকে জানিয়ে দেবেন।'

রিংকির কথা গণেশ হালদার এই প্রথম শুনল। গণেশ হালদার বলল, 'বাহ্, তোমারও তো খুব বুদ্ধি! তবে কপালীবাবাকে বলার দরকার নেই। আমি নিজেই কাল রাত্তিরে এখানে এসে খবর নিয়ে যাব। চলি।' এই বলে ও পুবদিকের জানলা দিয়ে বেরিয়ে রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নামতে লাগল।

গণেশ হালদার সবে অর্ধেকটা নেমেছে, এমন সময় জলটুঙির গেটের সামনে, রাস্তার ওপর একটা ট্রাক এসে থামল। ট্রাকটার ড্রাইভার পরপর তিনবার হর্ন বাজাল। অমনই জলটুঙির নীচের ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

গণেশ হালদার বুঝে নিল, এ-ভাবে ও যদি এখানে অপেক্ষা করে, স্মাগলাররা ওকে দেখতে পাবে। ও তাহলে এখন কী করবে? ওপরে উঠে যাবে, না নীচে নেমে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকবে? ওর মাথায় একটা মতলব এসে গেল। ও লাফ দিয়ে নীচে নেমে ভাসমান ব্রিজের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে গেটের পাশে একটা ঝাঁকড়া ঝাউগাছের আড়ালে আশ্রয় নিল।

বলহরি দরোজা খুলে দিলেন। ট্রাক থেকে কয়েকজন শ্রমিক পেটিগুলো নামিয়ে নিল। তারপর সেগুলো মাথায় করে তারা রেস্ট-হাউসে ঢুকে গেল। এরপর তারা রেস্ট-হাউসের ভেতর থেকে বেশ কিছু নতুন পেটি বের করে এনে সেগুলো ট্রাকে তুলে নিল। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে থাকা একটা লোক এবার ট্রাক থেকে নেমে রেস্ট-হাউসের ভেতরে গেল। তার হাতে একটা অ্যাটাচি। কিছুক্ষণ বাদে সে আবার ফিরে এসে ট্রাকে উঠল।

তার আসা-যাওয়ার ফাঁকে গণেশ হালদার আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ট্রাকের কাছে এসে ট্রাক-ড্রাইভারের মাথায় আঘাত করে তাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। তারপর তাকে রাস্তার একপাশে ফেলে রেখে দিয়েছিল। শ্রমিকরা তখন ট্রাকের ওপরে বসে নিজেদের মধ্যে খোশ-গল্প করছিল। তারা এটা দেখতে পায়নি।

ট্রাক-ড্রাইভারের মাথায় যে টুপিটা পরা ছিল, গণেশ হালদার সেটা খুলে নিয়ে নিজের মাথায় পরে নিয়েছিল। তারপর ও ড্রাইভারের সিটে বসে পড়েছিল। লম্বা-চওড়ায় ড্রাইভারের চেহারাটাও অনেকটা ওরই মতন।

ড্রাইভারের পাশের সিটের লোকটা ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে পড়ল। তারপর হুকুম করল, 'চলো।'

গণেশ হালদার ট্রাকটা ছেড়ে দিল। ওর পাশের লোকটা সামনের দিকে তাকিয়ে গুম হয়ে বসে রইল। আকালপুরের আগেই দেখা গেল একটা মোটরগাড়ি রাস্তার ঠিক মাঝখানে তেড়চা ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গণেশ হালদার হর্ন দিল। তবুও গাড়িটার নড়বার লক্ষণ নেই।

গণেশ হালদারের পাশের লোকটা এবার নেমে পড়ল। রিভলবার হাতে নিয়ে গাড়িটার কাছে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির মধ্যে টর্চের আলো ফেলল। তারপর অবাক গলায় বলে উঠল, 'আরে এ যে দেখছি দারোগা সাহেব! এঁর তো এখন থাকার কথা নাগরাজের গুহায়। ইনি এখানে এলেন কী করে? করম সিং, একবার নেমে এসো তো ভাই। সাহেবের হাত-পা-মুখ বাঁধা রয়েছে। জেগে আছেন, না অজ্ঞান হয়ে আছেন বুঝতে পারছি নে। তুমি নেমে এসে একবার পরখ করে দেখে নাও। বুঝে উঠতে পারছি নে, নাগরাজ নিজেই এঁকে এখানে এ-অবস্থায় রেখে গিয়েছেন কি না। যদ্দূর জানি, পল্টন এঁকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল নাগরাজের গুহায়।'

গণেশ হালদার বুঝে নিল, পল্টন নামে নাগরাজের এক শাগরেদ

BanglaBook.org

নীলাম্বরবাবুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছিল নাগরাজের গুহায়। এ-ও বুঝে নিল, এই ট্রাকটার ড্রাইভারের নাম করম সিং, যাকে ও অজ্ঞান করে ফেলে রেখে এসেছে জলটুঙির সামনে।

গণেশ হালদার ট্রাক থেকে নেমে গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেল। জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে দেখল নীলাম্বর মজুমদারই বটে।

নীলাম্বরবাবুর মাথা-মুখ ঢাকা ছিল যে-টুপিটা দিয়ে, সেটা ও সরিয়ে নিল। নীলাম্বরবাবুর হাত-পায়ের বাঁধনগুলোও ও খুলে নিল। উনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। হাত-পা মুক্ত হতেই উনি গণেশ হালদারের মাথাটা দু'হাতে চেপে ধরে গাড়ির মধ্যে টেনে নিলেন। গণেশ হালদারের মাথার টুপিটা তখনই খুলে গেল।

'ছেড়ে দাও, আমি গণেশ হালদার।' ফিসফিসে গলায় উচ্চারণ করল গণেশ হালদার। তারপর ছাড়া পেয়ে মাথাটা ও বের করে আনল। ও খেয়াল করল না ওর মাথায় এখন টুপি নেই।

চাঁদের আলোয় গণেশ হালদারের মুখটা আবছা দেখতে পেল নাগরাজের শাগরেদ। তাতেই সে নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। অমনই রিভলভারটা গণেশ হালদারের দিকে তাক করে ধরে বলে উঠল, 'করম সিং কোথায়?'

গণেশ হালদার ঠান্ডা গলায় বলল, 'সে জলটুঙির সামনে পড়ে আছে। এতক্ষণে হয়তো তার জ্ঞান ফিরে এসেছে।'

'তুমি কে?' লোকটা শুধোল।

'আমি গণেশ হালদার।'

'আমি গগন বারিক। দু'হাত ওপরে তোলো।'

গগন বারিক গণেশ হালদারের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। গণেশ হালদার দু'হাত ওপরে তোলার ভান করে এক হাত দিয়ে গগন বারিকের রিভলভার ধরা হাতে একটা প্রচণ্ড চাঁটি মারতেই রিভলভারটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। গণেশ হালদারের অন্য হাতটাও সক্রিয় ছিল। এটা দিয়ে ও গগন বারিকের থুতনিতে একটা ঘুঁষি মারল।

গগন বারিক ক্যারাটে জানে। গণেশ হালদারের ঘুঁষি খেয়ে সে 'কিয়াই' বলে চিৎকার করে বাঁদিকে ঘুরে যাওয়ার সময় গণেশ হালদারের মুখ লক্ষ করে ডান হাত দিয়ে একটা ঘুঁষি হাঁকাল। এই স্টাইলটার নাম জোদান্তসুকি।

গণেশ হালদারও ক্যারাটে জানে। গগন বারিকের চাইতেও তৎপরতা ওর বেশি। ও মার খাওয়ার আগেই সরে গেল। তারপর কেন্ট সুই অর্থাৎ এক হাতের মুঠোর ধার দিয়ে গগন বারিকের হাতটাকে আঘাত করল। লড়াই জমে উঠল। কেউ কাউকে ছাড়বে না।

গাড়ির ভেতর বসে নীলাম্বরবাবু দৃশ্যটা উপভোগ করছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বন্ধু গণেশ হালদারকে সাহায্য করার কথা। শেষ পর্যন্ত গগন বারিক

BanglaBook.org

মার খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতেই প্রদর্শনীর দর্শকের মতন তিনি সানন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে গণেশ হালদারের হাতে হাত রেখে বললেন, 'সাবাস!'

এই সুযোগে গগন বারিক উঠে পড়ে পুবদিকের বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। ট্রাকের শ্রমিকরাও তাকে অনুসরণ করল।

॥ তেরো ॥

জিৎ-বুড়ি ফিরে এল

বিপদে যারা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে, সাধারণত তারাই বিপদকে জয় করতে পারে। গণেশ হালদারের মুখ থেকে বহুবার শোনা একথা জিৎ মনে রাখলেও বুড়ি কিন্তু বিপদের সময় কথাটা বেমালুম ভুলে যায়। ফলে সে-সময় যা করা উচিত নয়, তা-ই করে বসে, যা কাউকে কখনওই বলা উচিত নয়, তা-ও ও বলে বসে। এখনও তাই-ই করল।

যে লোকটা জিৎ-বুড়িকে জোর করে ধরে এনে মোটর-গাড়িতে উঠিয়েছিল, তার ওপর বুড়ি ভীষণ রেগে গিয়েছিল। ঘণ্টাখানেক পরে গাড়িটা যখন নাগরাজের গুহার সামনে এসে দাঁড়াল, আর সেই লোকটা ওকে হাত ধরে নামাতে গেল, অমনই ও লোকটার দু'চোখে দু'হাতের তর্জনী ঢুকিয়ে দিল। লোকটা যন্ত্রণায় 'চোখ গেল' বলে চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকারে গাড়ির অন্য লোকগুলো তৎপর হয়ে উঠল। তারা গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে জিৎ-বুড়ি দুজনেরই গালে কয়েকটা চড় কষিয়ে দিল। তারপর ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলল নাগগুহার ভেতরে। সুন্দর ইতিমধ্যে সবার অলক্ষ্যে লাফ দিয়ে একটা গাছের ডালে চড়ে বসেছে।

নাগরাজ তার কয়েকজন শাগরেদের সঙ্গে কথা বলছিল। জিৎ-বুড়ির পরিচয় জানার পর সে কী যেন চিন্তা করল। তারপর একজন শাগরেদকে বলল, 'ঝন্টু, এদের গারদঘরে নিয়ে যাও।'

ঝন্টু জিৎ-বুড়িকে নিয়ে একটা সরু প্যাসেজ দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল। সুন্দর এ-সময় নাগরাজের ঘরের জানলার কাছে এসে ওর গলায় ঝোলানো ছোট্ট টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে দিল।

নাগরাজ একজন শাগরেদকে ডেকে বলল, 'তুমি খুব ভুল কাজ করেছো, পল্টন। দারোগাবাবুকে এখানে আনাটা ঠিক হয়নি। পুলিশকে বলা হয় ঘোগ। ঘোগ হচ্ছে বাঘের শত্রু। বাঘের ঘরে ঘোগকে রাখা ঠিক নয়।' ওর কথায় অবাঙালি টান।

BanglaBook.org

পল্টন বলল, 'কিন্তু ওস্তাদ, আপনি তো বাঘ নন। আপনি হচ্ছেন নাগরাজ।'

নাগরাজ বলল, 'আমি তোষামোদ চাই নে। কাজ চাই। পুলিশকে আমার চাইতে তুমি বেশি চেনো না। আমিও একসময় পুলিশে চাকরি করতাম। যাকগে, এখন যা বলছি শোনো। দারোগাবাবুর হাত-পা বেঁধে, চোখ-মুখ ঢেকে রেখে এসো আকালপুর আর কপালীবাবার আশ্রমের মাঝখানে, বড়ো রাস্তার ওপর, গাড়িটা সুদ্ধু। বাচ্চা দুটোকে যখন পাওয়া গিয়েছে, তখন গণেশ হালদারকেও পাওয়া যাবে। আমার দরকার ওই ডিটেকটিভটাকেই। একবার ওকে নাগগুহার গারদে ঢোকাতে পারলে আর ছাড়াছাড়ি নেই। বাছাধনকে এখানেই পচে মরতে হবে।'

পল্টন বলল, 'নিশ্চয়ই মরতে হবে।'

নাগরাজ বলল, 'ভালো কথা, তুমি তো একসময় বলহরির দলে ছিলে। শুনেছি, তুমি ওর জামাইয়ের ভাগনী দুটোকে জলটুঙিতে আসতে দিতে চাওনি। মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার সাহস পেয়েছিলে কোথা থেকে?'

পল্টন বলল, 'সাহস পেয়েছিলাম জলটুঙির আসল মালিকের কাছ থেকে। তিনি চাননি মেয়ে দুটো ওখানে আসুক। তাই আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ত্রিশূল-চিহ্নিত তাঁর নিষেধ-বাণী নীলছবি গাঁয়ে গিয়ে পিংকি-রিংকির হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে।'

'জলটুঙির আসল মালিককে তুমি কখনো দেখেছ?' নাগরাজ শুধোল।

'না ওস্তাদ, দেখিনি। শুধু নির্দেশ পেয়েছি। তিনি বলেন, তাঁর দল কেউ ছাড়লে তাকে তিনি বাঁচিয়ে রাখেন না।' একটু থেমে পল্টন ফের বলল, 'বিজয়া দশমীর দিন আমি আপনার নির্দেশে যখন কোচবিহার গিয়েছিলাম গোয়েন্দা গণেশ হালদারের খবর নিতে, তখন অলকা হোটেলে কল্লোল বিশ্বাস নামে একজন প্রফেসরকে দেখেছিলাম ওদের সঙ্গে। তা সেই প্রফেসর হঠাৎ আমার ওপর চড়াও হন। আমি অবশ্য পালিয়ে আসি। এই প্রফেসর লোকটার আসল পরিচয় কী কে জানে!'

'চেহারা কেমন?'

'লম্বা প্রায় ছ'ফুট। গায়ের রঙ ফর্সার দিকে। বয়েস পঞ্চাশের মতন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। কপালে আর ডানদিকের গালে কাটা দাগ।'

'ও-রকম চেহারার লোক আগে কোথাও দেখেছ কিনা মনে করার চেষ্টা করো। কিন্তু জলটুঙির আসল মালিককে খুঁজে বের করতেই হবে। ভালো কথা, বাংলাদেশের করিম ভাইয়ের খবর কী? সে নাকি পূজনলালের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এখন বলহরির সঙ্গে কারবার করছে? আর সেইজন্যে নাকি পূজনলাল রেগে গিয়ে এগারোই অক্টোবর চারজন লোক পাঠিয়েছিল বোমা মেরে জলটুঙিটা

BanglaBook.org

উড়িয়ে দিতে? এমনও শুনেছি বলহরি তাদের খুন করে ডেডবডিগুলো করিম ভাইয়ের মারফত বাংলাদেশে পার করে দিয়েছে। খবর নাও দেখি।' নাগরাজ বলল।

পল্টন বলল, 'আমি খবর নিয়েছি, ওস্তাদ। আপনার ইনফরমেশন সঠিক।'

'বাহ্! তোমার মতন একজন লোককে পেয়ে দলের শক্তি বেড়েছে। এখন যাও, দারোগাবাবুকে যেভাবে রেখে আসতে বলেছি, রেখে এসো। আর জলটুঙির অদৃশ্য মালিকটাকে খুঁজে বের করো। তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চাই।' বলেই নাগরাজ অন্য ঘরে চলে গেল।

এরপর পল্টন ভেতরে গিয়ে আবার দারোগাবাবুর হাত-পা বেঁধে মাথায় উল্টো করে একটা মাংকি-ক্যাপ পরিয়ে দিল। সেই অবস্থায় তাঁকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল বড়ো রাস্তায়। সেখানে রাস্তার ওপর তেড়চা অবস্থায় গাড়িটাকে রেখে এল।

এর পরের ঘটনা অর্থাৎ নীলাম্বরবাবুকে গণেশ হালদার কোথায় কী অবস্থায় উদ্ধার করে, তা আগেই জানানো হয়েছে।

কথাবার্তা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিল। তারপর জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারল। জানলাটা থেকে ঘরের মেঝে অনেক নীচে। সেখানে কেউ নেই। লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল সুন্দর। তারপর গুটি গুটি দেয়াল ঘেঁষে এ-ঘর থেকে ও-ঘর করতে করতে একসময় জিৎ-বুড়ির গায়ের গন্ধ পেয়ে গেল। আর ঠিক তখনই ও দেখতে পেল একটা লোক করিডোরের শেষ মাথার একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে তাতে তালা লাগিয়ে দিল।

সুন্দর এবার একটা লুকোবার জায়গা খুঁজতে লাগল। এ-দিক ও-দিক তাকাতেই ও দেখতে পেল একটা জায়গায় কয়েকটা পুরোনো আসবাবপত্র জড়ো করা হয়েছে। অমনই ও লাফ দিয়ে সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল। একটু খুটখাট শব্দ হল।

শব্দটা লোকটার কানেও গেল। এরই নাম ঝন্টু। নাগরাজ একেই হুকুম করেছিল জিৎ-বুড়িকে গারদঘরে রেখে আসার জন্য।

ঝন্টুর কানে শব্দটা যেতেই ও সতর্ক চোখে করিডোর বরাবর তাকাল। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেল না। তবুও সন্দেহটা ওর মন থেকে গেল না। ও এগিয়ে এসে আসবাবপত্রের স্তূপের পাশে দাঁড়াল। তারপর স্তূপটা ভালো করে দেখার জন্য হাত দিয়ে একটা ভাঙা চেয়ার সরাল। তখনই ও দেখতে পেল সুন্দরকে।

নাগরাজের গুহার মধ্যে কী করে একটা বাঁদর ঢুকতে পারে, ঝন্টু ভেবে পেল না। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সে যেই 'বাঁদর' বলে চেঁচাতে যাবে অমনই সুন্দর একটা টেবিলের ভাঙা পায়া দিয়ে তাকে মারতে গেল। ঝন্টু ঝট করে সরে গিয়ে

BanglaBook.org

চুল আর কান ধরে টানতে লাগল।

টেবিলের পায়াটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর সেটা তুলল সুন্দরকে মারবে বলে।

আঘাত লাগার আগেই সুন্দর চোখের নিমেষে লাফ দিয়ে ঝন্টুর কাঁধের ওপর চড়ে বসল। তারপর ওর চুল আর কান ধরে টানতে লাগল। ঝন্টু টেবিলের পায়াটা ফেলে দিয়ে দু'হাতে সুন্দরের মার ঠেকানোর চেষ্টা করল। ঝটাপটিতে টান সামলাতে না পেরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ঝন্টু মেঝের ওপর পড়ে গেল। সুন্দর তখন টেবিলের পায়াটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মাথায় সজোরে একটা বাড়ি মারল। ঝন্টু জ্ঞান হারাল।

এরপর সুন্দর তালাবন্ধ ঘরটার দরোজার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু তালা খুলবে কী করে? ও তখন ফিরে এল ঝন্টুর কাছে। তারপর ওর পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে নিয়ে দরোজাটার কাছে চলে গেল।

ঠিক এমন সময় পেছনে কারো সাড়া পেল সুন্দর। একটা লোক করিডোর দিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে। সুন্দর একটা জানলার ওপর লাফিয়ে উঠল। এখানকার জানলাগুলো দেয়ালের ওপর দিকে। অনেকটা ঘুলঘুলির মতন, তবে ঘুলঘুলির চাইতে বড়ো, আবার সাধারণ জানলার চাইতে ছোটো। কোনও জানলাতেই গরাদ নেই।

গান গাইতে গাইতে লোকটা আসবাবপত্রের স্তূপের কাছে এসে ঝন্টুকে দেখে থমকে দাঁড়াল। লোকটার হাতে ছিল টিফিন ক্যারিয়ার আর একটা ঘটি। জিৎ-বুড়ির জন্য সে খাবার আর জল নিয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গীকে এ-অবস্থায় দেখে জিৎ-বুড়ির কথা ভুলে সে ঘটির জল নিয়ে ঝন্টুর চোখেমুখে ছিটে দিতে লাগল।

জলের ঝাপটা পড়তেই ঝন্টুর জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলল। সে বলল, 'বিষ্টু বাঁদরটাকে দেখেছিস?'

বিষ্টু বলল, 'কী বলছিস রে, তুই! এখানে বাঁদর কোত্থেকে আসবে?'

ঝন্টু বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু বাঁদর সত্যিই এসেছে। তার হাতে মার খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর সুন্দরের খোঁজে গারদঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। বিষ্টুও তার সঙ্গে গেল।

ঝন্টু আর বিষ্টুকে আসতে দেখেই সুন্দর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একটা লাফ মারল। তারপর একটা জামগাছের ডালে উঠে বসল।

লোক দুটো সুন্দরকে খুঁজে না পেয়ে ভীষণ রেগে গেল। তারা জিৎ-বুড়িকে খাবার-টাবার না দিয়েই করিডোরের অন্য দিকে খুঁজতে গেল।

এদিকে জিৎ আর বুড়ি বন্দী হয়ে রইল গারদঘরে। ঘরটা স্যাঁতসেঁতে। কিন্তু বড়ো। একটা খাটিয়া ছাড়া ঘরটায় অন্য কোনও ফার্নিচার বা জিনিস-পত্তর নেই। এমন কি জলের কুঁজো বা গেলাস পর্যন্ত নেই। ঘরটায় একটাই দরোজা। ওপরের দিকে আছে একটা ঘুলঘুলির মতন জানলা। সেখান দিয়েই কিছুটা আলো-বাতাস আসছে।

BanglaBook.org

জিৎ বলল, 'বুড়ি, তোর ভয় লাগছে?'

বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ দাদা, আমার ভীষণ ভয় করছে। এখন কী হবে?'

'কী আর হবে? কয়েকটা দিন এখানে বিশ্রাম নিতে হবে।'

কাঁদো কাঁদো গলায় বুড়ি বলল, 'কতদিন?'

জিৎ হাল্কা গলায় বলল, 'অনির্দিষ্ট কাল।'

বুড়ি বলল, 'গণেশকাকু কি আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না?'

'নিশ্চয়ই করবে। তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে এখান থেকে বেরোনোর জন্যে।'

'কী করে বেরোনো যাবে?'

'মতলব বের করতে হবে।' একটু থেমে ওপরের ঘুলঘুলির মতন জানলাটার দিকে তাকিয়ে জিৎ ফের বলল, 'আমার মাথায় তো এখুনি একটা মতলব এসে যাচ্ছে।'

বুড়ি জানতে চাইল, 'কী মতলব? ওই জানলাটা দিয়ে পালানোর চেষ্টা? কিন্তু ওটা তো অনেক ওপরে।'

'সেটাই তো মাথা খাটিয়ে বের করতে হবে।' জিতের কথা সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন জানলার ওপর লাফিয়ে উঠল।

বুড়ি অমনই চেঁচিয়ে বলল, 'সুন্দর!'

জিৎও সুন্দরকে দেখতে পেল। তারপর বুড়িকে বলল, 'চেঁচাস নে। কেউ শুনতে পেলে প্ল্যানটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

সুন্দর লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে নেমে এল। বুড়ি ওকে কোলে তুলে নিল। সুন্দর অমনই ওর গলায় ঝোলানো টেপ-রেকর্ডারটা চালিয়ে দিল। শোনা গেল নাগরাজ আর তার শাগরেদের কথাবার্তা। জিৎ-বুড়ি জেনে গেল এই শাগরেদটার নাম পল্টন। একেই সেদিন কল্লোল বিশ্বাস হোটেলে মার দিয়েছিলেন। সার্কিট হাউসে এই-ই নিয়ে গিয়েছিল একটা গোখরো সাপ। তারপর গতকাল বিকেলে দিনহাটা থানার দারোগা নীলাম্বর মজুমদারকে এখানে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছিল। এই লোকটাই জলটুঙির আসল মালিকের হয়ে পিংকি-রিংকির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল ত্রিশূলের নিষেধাজ্ঞা। তবে জলটুঙির আসল মালিককে পল্টন কখনও চোখে দেখেনি। নাগরাজও তাকে চেনে না।

বুড়ি জিৎকে শুধোল, 'জলটুঙির আসল মালিকটা কে?'

জিৎ হাল্কাভাবে বলল, 'নাগরাজের মাসতুতো ভাই। তাকে চিনতে গেলে এই নাগরাজের গুহা থেকে আমাদের বেরোতেই হবে।'

এমন সময় বাইরে দরোজার তালা খোলার শব্দ হল। জিতের ইশারায় সুন্দর চৌকির তলায় লুকিয়ে পড়ল। জিৎ আর বুড়ি শান্ত হয়ে খাটিয়ার ওপর বসে রইল। ঘরে ঢুকল বিষ্টু। ওর হাতে টিফিন ক্যারিয়ার আর একটা ঘটি।

BanglaBook.org

লোকটা বলল, 'এই টিফিন ক্যারিয়ারে রুটি আর আলুর তরকারি আছে। আর এই ঘটিতে আছে জল। খেয়ে নাও। আরে, এটা আবার কী? রেডিও নাকি?' বলেই খাটিয়ার ওপর থেকে টেপ-রেকর্ডারটা সে কুড়িয়ে নিল।

জিৎ বলল, 'ওটা রেখে দিন।'

লোকটা বলল, 'কেন? রাখব কেন? এটা আমার।' বলেই সে টেপ-রেকর্ডারটা পকেটে পুরতে গেল।

বুড়ি অমনই ছোঁ মেরে যন্ত্রটা কেড়ে নিতে গেল। লোকটাও বাধা দিল। দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি থেকে হাতাহাতি শুরু হতেই জিৎ লোকটার নাকে একটা ঘুঁষি মারল। লোকটার নাক ফেটে গেল। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। সে এবার বুড়িকে ছেড়ে দিয়ে জিৎকে আক্রমণ করল।

লোকটা পেশাদার গুন্ডা। ঘুঁষি মারার কায়দা-কানুন তার জানা আছে। পাল্টা আক্রমণে সে জিৎকে ধরাশায়ী করে ফেলল। বুড়ি লোকটাকে এলোপাথাড়ি কয়েকটা কিল-চড় মারল। তাতেও সুবিধা হল না। সে টেপ-রেকর্ডারটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল। এমন সময় সুন্দর খাটিয়ার তলা থেকে বেরিয়ে এসে একটা লাফ দিয়ে লোকটার কাঁধে চেপে বসেই তার চোখ দুটো টিপে ধরল। জিৎ এই সুযোগে উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার পেটে একটা লাথি মারল। বুড়ি টিফিন ক্যারিয়ারটা তুলে নিয়ে লোকটার মাথার পেছন দিকে আঘাত করল। সুন্দর তার কান দুটো আচ্ছা করে মলে দিল। লোকটা মার খেয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। জিৎ লোকটার মুখে আরও কয়েকটা ঘুষি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল। তারপর দরোজাটা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিল।

বুড়ি বলল, 'দাদা, এখন কী হবে?'

জিৎ বলল, 'পালাতে হবে।' বলেই খাটিয়াটা লম্বালম্বি করে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমি যে-ভাবে উঠছি, তুই-ও সে-ভাবে উঠে আয়। উঠতে পারবি তো?'

বুড়ি বলল, 'পারব। তুমি আগে উঠে যাও।'

জিৎ খাটিয়ার দড়িতে পায়ের আঙুল গলিয়ে ওপরে উঠে গেল। খাটিয়ার শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে জানলাটাকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল। দু'হাতে ভর দিয়ে জানলার ফাঁকে ও কোনওরকমে উঠে বসল। ওর দেখাদেখি বুড়িও ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই পা ফসকে নীচে পড়ে গেল। তারপর ফের চেষ্টা করল। এবারও পড়ে গেল। তিনবারের চেষ্টায় ও খাটিয়ার শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। জিৎ ওর হাত ধরে ওপরে টেনে তুলল। তারপর একে একে দুজনেই বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

এবার সুন্দরের পালা। সে এ-পথে না গিয়ে দরোজা খুলে বাইরে গেল। তার আগে টেপ-রেকর্ডারটা মালার মতন করে গলায় ঝুলিয়ে নিল আর খাটিয়াটা নামিয়ে আগের জায়গায় বসিয়ে দিল। বাইরে এসে দরোজার পাল্লা দুটো বন্ধ

BanglaBook.org

করে তাতে শিকল এঁটে দিল। তারপর করিডোরের জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

বাইরে জিৎ আর বুড়ি ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। সুন্দর আসতেই জিৎ বলল, 'এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে। কিন্তু এ তো দেখছি একটা উঁচু ঢিবি। এর গায়ে কেবলই ঝোপ-ঝাড়। ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। অন্ধকারে এগোনো মুশকিল। সুন্দর, তুই আগে চল। বুড়ি, তুই মাঝখানে থাক। আমি পেছনে থাকছি।'

সুন্দর মানুষের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও মানুষের ভাষা বোঝে। তাই জিৎ নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে আগে চলল। অনেকক্ষণ চলার পর ওপর যখন বড়ো রাস্তায় এসে উঠল, তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে।

একটু পরেই পাখি ডাকবে। লাল টকটকে সূর্য উঠবে পুব-আকাশে। মানুষজন জেগে উঠবে।

॥ চোদ্দ ॥

রাজপাট দর্শন

প্রফেসর কল্লোল বিশ্বাস দিনহাটার সার্কিট হাউসে এসে উঠেছিলেন ২০ অক্টোবর সন্ধের সময়। ঠিক হয়েছিল পরদিন উনি গণেশ হালদারদের রাজপাট দেখাতে নিয়ে যাবেন। সেইমতো ২১ অক্টোবর সকাল ৯টার মধ্যে চান-খাওয়া সেরে রওনা দিল ওরা। প্রফেসর বিশ্বাস গাড়ি ঠিক করেছিলেন। ওদের সঙ্গে নীলাম্বরবাবুরও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ কাজে তিনি আটকে পড়ায় তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

গাড়ি চালাচ্ছেল প্রফেসর নিজেই। রাজপাট যাওয়ার পথে পড়ে গোঁসানীমারি। এখানে আছে কামতেশ্বরীর মন্দির। প্রফেসর গাড়িটাকে পশ্চিমদিকে মন্দিরে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথটার সামনে নিয়ে গিয়ে থামালেন। ওরা একে একে গাড়ি থেকে নামছে এমন সময় আর-একটা গাড়ি এসে খানিকটা দূরে গিয়ে থামল। গাড়িটার রঙ কালো। তাতে মোট তিনজন আরোহী। তিনজনের চেহারাই প্রকাণ্ড। হাইট ছ'ফুটের কম না। প্রত্যেকের পরনে ফুল প্যান্ট। গায়ে রঙিন গেঞ্জি।

লোকগুলো গাড়ি থেকে নামার আগেই প্রফেসর বিশ্বাস গণেশ হালদারকে বললেন, 'মিস্টার হালদার, এ-অঞ্চলে ইদানীং দেব-দেবীর ভক্তের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। এটা শুভ লক্ষণ, না অশুভ, কিছুদিনের মধ্যেই তা জানা যাবে। চলুন, মা-ভবানীকে দর্শন করা যাক।' বলেই উনি গেট দিয়ে ভেতরের দিকে এগোতে লাগলেন। গণেশ হালদার, বুড়ি ও জিৎ তাঁকে অনুসরণ করল।

মন্দিরে ঢুকেই বুড়ি জানতে চাইল, 'এখানে দেবী কামতেশ্বরীর মূর্তি কোনটা?'

BanglaBook.org

প্রফেসর বললেন, 'এখানে কামতেশ্বরীর মূর্তি নেই। মূর্তির বদলে পুজো করা হয় তাঁর প্রতীককে। দেবীর আদি মন্দির আর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজপাটে। চোদ্দশ আটানব্বই সালে হোসেন শাহের আক্রমণের সময় সে-সব নষ্ট হয়ে যায়। এই গোঁসানীমারির মন্দিরে যে-মূর্তিটা ছিল, সেটা কবে কী ভাবে উধাও হয়, তা বলতে পারব না। তবে কামতেশ্বরীর মূর্তি না থাকলেও ব্রহ্মা, শিব, নারায়ণ, ব্রোঞ্জের সূর্যমূর্তি আর অষ্টধাতুর গোপালমূর্তি আছে। ওই দেখো।' এই বলে উনি আঙুল দিয়ে মূর্তিগুলো দেখিয়ে দিলেন।

গণেশ হালদার বলল, 'দেবী কামতেশ্বরীর মন্দিরে এ-সব মূর্তির অবস্থান বেমানান। মনে হয় অন্য জায়গা থেকে এ-সব মূর্তি কুড়িয়ে এনে দেবী কামতেশ্বরীর অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বললেন প্রফেসর।

এরপর গণেশ হালদাররা মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কালো রঙের গাড়িটার আরোহীরা তখন মন্দির-চত্বরে ঢুকে মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির ফটো তুলছে।

যে লোকটার হাতে ক্যামেরা ছিল, সে গণেশ হালদারকে বলল, 'আপনারা যদি দয়া করে মন্দিরে সামনেটায় সার হয়ে দাঁড়ান, আপনাদের একটা ছবি তচলে নিতে পারি।'

গণেশ হালদার বলল, 'আমাদের ছবি আপনাদের কী কাজে লাগবে? তার চাইতে বরং আপনারাই সার হয়ে দাঁড়িয়ে যান, আপনাদের একটা ছবি তুলে দিই।' বলেই ও লোকটার হাত থেকে ক্যামেরাটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল।

লোকটা বলল, 'নো, থ্যাঙ্কস্। আমার ক্যামেরা আমি কাউকে দিই না।' এর গায়ে নীল রঙের গেঞ্জি।

এমন সময় জিৎ ওর ক্যামেরাটা ব্যাগ থেকে বের করে ক্লিক করে লোকগুলোর একটা ফটো তুলে নিল। অমনই তাদের একজন এগিয়ে এসে জিতের ওপর চড়াও হল। বলল, 'আমাদের পারমিশন না নিয়ে ছবি তুললে কেন?' এর গায়ে ছিল কালো-হলুদ ডোরাকাটা গেঞ্জি।

প্রফেসর বিশ্বাস হাসতে হাসতে বললেন, 'দেবতাদের ছবি তোলার পারমিশন লাগে না।'

'আপনি দেবতা বলছেন কাদের?' ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা লোকটা শুধোল।

'আপনাদের।' প্রফেসর বললেন।

'কী করে জানলেন আমরা দেবতা?'

'আপনাদের চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে।'

নীল গেঞ্জি পরা লোকটা বলল, 'আপনার হিসেবে ভুল হয়েছে। আমরা দেবতা নই।'

BanglaBook.org

প্রফেসর বললেন, 'তা হলে বোধহয় আপনারা অপদেবতা।'

ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা লোকটা বলল, 'আপনি যা খুশি বলতে পারেন, কিন্তু ছবির রিলটা আমাদের চাই। খোকন, তোমার ক্যামেরাটা দাও তো। রিলটা বের করে নিই।' বলেই জিতের কাছ থেকে সে ক্যামেরাটা কেড়ে নিতে গেল।

জিৎ দু'-পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'খবরদার, আমার ক্যামেরায় হাত দেবেন না।'

'তা হলে তুমি নিজে বের করে দাও।' ডোরাকাটা বলল।

প্রফেসর বললেন, 'কেন অনর্থক ঝামেলা করছেন! আপনাদের ছবি তুলেছে তো হয়েছে কী? আপনারাও আমাদের একটা ছবি তুলে নিন।'

ক্যামেরাম্যান বলল, 'তা হয় না। ওই রিলটা চাই।'

গণেশ হালদার বলল, 'তা হলে এক কাজ করুন। আপনারা বরং ওর ক্যামেরাটাই নিয়ে নিন। জিৎ, তোমার ক্যামেরাটা দাও তো।' বলেই ও জিতের কাছ থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে প্রতিপক্ষ ক্যামেরাম্যানের দিকে বাড়িয়ে ধরল। তারপর বলল, 'এই নিন। আর আপনার ক্যামেরাটা ওকে দিন।'

'এটা হতে পারে না। আমার ক্যামেরাটা ওটার চাইতে অনেক দামি।'

গণেশ হালদার বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে রিল বদল করা যাক। দিন আপনার ক্যামেরাটা।'

এ-সময় কালো গেঞ্জি পরা লোকটা, যে ড্রাইভারের সিটে বসেছিল, গণেশ হালদারের কাছে এগিয়ে এসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আমরা শুধু নিই, কাউকে দিই না কিছু।' এই বলে সে গণেশ হালদারের হাত থেকে ছোঁ মেরে ক্যামেরাটা কেড়ে নিতে গেল।

কিন্তু কালো গেঞ্জি জানে না, গণেশ হালদারের ক্ষিপ্রতার জোর। গণেশ হালদার নিজের ক্যামেরা-ধরা হাতটা সরিয়ে নিয়েই অন্য হাত দিয়ে লোকটার বাড়িয়ে ধরা হাতটা চেপে ধরল। তারপর সেটায় একটু চাপ দিতেই লোকটা যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। তাকে উদ্ধার করার জন্য নীল গেঞ্জি ক্যামেরাম্যান এগিয়ে আসতেই গণেশ হালদার প্রথম লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই ক্যামেরাটা কেড়ে নিল। অমনই তিনজন লোকই গণেশ হালদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল।

গণেশ হালদার একপাশে লাফ দিয়ে সরে গিয়ে ক্যামেরা দুটো প্রফেসরের হাতে তুলে দিয়েই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। খালি হাতের লড়াইয়ে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানো গণেশ হালদারের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। ক্যারাটের কৌশলে মুহূর্তমধ্যে তিনজনকেই সে ধরাশায়ী করে ফেলল।

প্রফেসর বিশ্বাস ইতিমধ্যে ক্যামেরা থেকে রিলটা বের করে নিয়েছেন। খালি ক্যামেরাটা উনি ছুঁড়ে দিলেন ক্যামেরাম্যানের দিকে। তারপর গণেশ হালদারের

BanglaBook.org

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাবাশ, মিস্টার হালদার! চলুন, আর দেরি নয়।' বলেই উনি গাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। গণেশ হালদার বুড়ি, জিৎ আর সুন্দরকে নিয়ে তাঁকে অনুসরণ করল।

পথে আর কোনও ঝামেলা হয়নি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গণেশ হালদাররা রাজপাটে এসে উপস্থিত হল।

রাজপাট এখন প্রাচীন রাজপুরীর ধ্বংসস্তূপ। প্রাসাদের পরিবর্তে সেখানে দেখা যায় বিশাল একটা ঢিবি।

প্রফেসর বিশ্বাস সবাইকে নিয়ে ঢিবির ওপর উঠে আসতেই বুড়ি সেখান থেকে এক-টুকরো ইট কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এখানে রাজবাড়ি কই?'

'রাজবাড়ি আগে ছিল, এখন নেই। যেমন নেই দেবী কামতেশ্বরীর আদি মন্দিরটা। সেটাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

জিৎ বলল, 'তাই যদি হয়, মন্দিরটা তা হলে মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে। মাটি খুঁড়লে মন্দিরের সঙ্গে কামতেশ্বরীর মূর্তিটাও পাওয়া যেতে পারে।'

গণেশ হালদার বলল, 'জিৎ কিন্তু কথাটা মন্দ বলেনি।'

প্রফেসর বললেন, 'সরকারকে বলে ঢিবিটা খোঁড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

গণেশ হালদার বলল, 'সাধারণ লোকেরা আগে যে এখানে অনেক বার খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, তার প্রমাণ রয়েছে। তাদের কেউ যদি মূর্তিটা পেয়ে থাকে, সে হয়তো সেটা নিজের বাড়ির ঠাকুরঘরে রেখে দিয়েছে কিংবা মূর্তি-চোরদের কাছে বেচে দিয়েছে। অথবা মূর্তি-চোররা নিজেরাই এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে সেটা পেয়ে থাকলে সরিয়ে ফেলেছে।'

ঢিবিটার ওপর গোটা কয়েক মূর্তি-ফলক রয়েছে। এসব দেখে বুড়ি খুশি হল না। ওকে বেশ নিরাশ দেখাচ্ছে।

জিৎ এক-টুকরো পাথর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নতুন একটা টুকরো তুলে নিল।

'এখানে টাঁকশাল আর ভুলকাভুলকি কোথায়?' গণেশ হালদার প্রফেসর বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে শুধোল।

প্রফেসর বললেন, 'চলুন, দেখাব। জায়গা দুটো আছে, কিন্তু বাড়ি দুটো নেই।'

টাঁকশালে এসে দেখা গেল সেখানে কেবল পড়ে আছে কয়েকটা পাথরের টুকরো আর কারুকাজ করা কয়েকটা থাম।

বুড়ি বলল, 'টাঁকশালে তো টাকা দেখছি নে।'

জিৎ বলল, 'আমি কিন্তু দেখতে পেয়েছি।' বলেই ও একটা গর্তের মধ্যে পড়ে থাকা একটুকরো খাবরা কুড়িয়ে নিল।

'দেখি।' বলে বুড়ি প্রায় ছোঁ মেরে জিতের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু জিৎ হাতটা সরিয়ে নিল।

BanglaBook.org

এমন সময় দেখা গেল একটা কালো রঙের গাড়ি ওদের থেকে খানিকটা দূরে এসে থামল। তবে গাড়ি থেকে কেউ নামল না। খানিকক্ষণ থেমে থাকার পর গাড়িটা যে-পথে এসেছিল, সে-পথে চলে গেল।

গণেশ হালদার বলল, 'ওরা যাচ্ছে কোথায়?'

বুড়ি শুধোল, 'ওরা কারা?'

প্রফেসর বিশ্বাস বললেন, 'যাদের সঙ্গে কামতেশ্বরীর মন্দিরে আমাদের লড়াই হয়েছিল, ওরা সেই লোক।'

বুড়ি বলল, 'তারাই যে গাড়ির মধ্যে ছিল, কী করে জানলেন?'

জিৎ বলল, 'গাড়িটার রঙ আর নম্বর দেখেই বোঝা গিয়েছে।'

প্রফেসর বললেন, 'গাড়ির রঙ আর নম্বর ছাড়াও অন্য ব্যাপারও আছে। যে-লোকগুলো গাড়ির ভেতর ছিল, তাদের গায়ের গেঞ্জির রঙও আমি দেখে নিয়েছি।'

গণেশ হালদার বলল, 'গাড়িটাকে ফলো করতে হবে। ওদের গন্তব্যস্থান না দেখে ফিরে যাওয়া চলবে না।' এই বলে ও নিজেদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আর সবাই ওকে অনুসরণ করল।

॥ পনেরো ॥

ভুলকাভুলকির অন্দরে

বেলা পড়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে ঝুঁকে পড়া সূর্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে এক ঝাঁক সাদা মেঘ। কখনও দূর কখনও বা কাছ থেকে ভেসে আসছে পাখির কাকলি। গাছ-গাছালির মৃদু-মিষ্টি গন্ধও বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে।

এরকম সময় গণেশ হালদাররা উপস্থিত হল ভুলকাভুলকির সামনে। কালো রঙের যে গাড়িটাকে ওরা ফলো করে এসেছে, সেটা একটা ঝাঁকড়া শেওড়াগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গণেশ হালদাররা সেটার উপস্থিতিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের গাড়িটাকে একেবারে ভুলকাভুলকির পাশে নিয়ে এসে থামাল।

ভুলকাভুলকি হচ্ছে একটা আজব প্রাসাদ। এখন প্রাসাদটার জায়গায় পড়ে রয়েছে তার ধ্বংসস্তূপ। চোখে পড়ার মতন একটা বড়ো ঢিবি ছাড়াও সেখানে আর যা আছে, তার নাম জঙ্গল। ঢিবিটার চারধারে অনেকটা এলাকা জুড়ে সেই জঙ্গলের বিস্তৃতি।

গাড়ি থেকে নেমেই গণেশ হালদার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে নিল কালো রঙের গাড়িটার আরোহীরা নেমেছে কি না। তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে ঢিবিটার ওপরে উঠতে লাগল।

সুন্দর যেন ওদের গাইড। সকলের আগে চারপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে

BanglaBook.org

লাগল ঢিবিটার ওপরে। ও এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল যেন জায়গাটা ওর চেনা।

গণেশ হালদার সুন্দরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে একটা কিছুর আঁচ পেয়েছে।'

ঢিবিটার ওপরে রয়েছে একটা পুরোনো বটগাছ। সুন্দর লাফ দিয়ে গাছটায় উঠে পড়ল। তারপর ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। অবশ্য গণেশ হালদাররা বটতলায় পৌঁছোনোর আগেই ও গাছ থেকে নেমে পড়ল। তারপর জিতের কাছে এসে এক লাফে ওর কাঁধে উঠে ওকে ঢিবিটার পেছন দিকে যাওয়ার জন্য ইশারা করতে লাগল।

জিৎ যেতে দ্বিধা করল না। অন্যরাও ঢিবিটার পেছন দিকে ঢাল বেয়ে নামতে লাগল।

ঢিবিটার পেছনে ঝোপঝাড় আর কিছু বুনো গাছ-গাছালি। বাবলা, সাঁইবাবলা, সোঁদাল, তেঁতুল, বেল, কতবেল ইত্যাদি গাছ। বেশির ভাগ গাছই স্বর্ণলতা, শ্যাম-লতা জাতের নানা লতায় ছাওয়া। দু-চারটে খেজুরগাছও রয়েছে। কোনও কোনও খেজুরগাছে ঝুলে রয়েছে বাবুইপাখির বাসা।

একটা খেজুরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ি অবাক হয়ে ঝুলে থাকা বাসাগুলো দেখতে লাগল। এ-জিনিস আগে কখনও দেখেনি ও। জিৎ বুড়িকে বলল, 'বাবুইপাখির বাসা পরে দেখলেও চলবে। এখন সুন্দর যা দেখাতে চাইছে, তা দেখবি চল।' এই বলে বুড়ির হাত ধরে সুন্দর আর গণেশ হালদার যেদিকে গেল, সেদিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল।

প্রফেসর বিশ্বাস যেতে যেতে ঢোল-কলমির ফুল ফুটে থাকতে দেখে অনুসরণ ভুলে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ওদিকে সুন্দরের পিছন পিছন গণেশ হালদাররা এগিয়ে চলল। চলতে চলতে জিৎ আর বুড়ির মনে হল জায়গাটা যেন ওদের চেনা।

ঢিবিটার পেছন দিকে এসে ওরা দেখতে পেল একটা পোড়ো বাড়ির দেয়ালের একটা অংশ। দেয়ালের ওপরে মাটির স্তূপ। সেই স্তূপের নীচে গোটা দুয়েক জানলা। জানলা দুটোয় না আছে পাল্লা, না আছে গরাদ। ঝোপঝাড়ের আড়ালে থাকায় জানলা দুটো সহজে নজরে পড়ে না।

সুন্দর ওদের নিয়ে এল জানলা দুটোর নীচে। একটা জানলার ওপর ও লাফিয়ে উঠল। তারপর অন্যদের সেখানে ওঠার জন্য ইশারা করতে লাগল। কিন্তু অন্যরা সেখানে উঠবে কী করে? জানলা দুটো ছিল ওদের নাগালের বাইরে। কাছেই পড়ে ছিল একটা গাছের ভেঙে পড়া ডাল। গণেশ হালদার সেটা কুড়িয়ে এনে দেয়ালের গায়ে একটা জানলার নীচে দাঁড় করাল। তারপর সেটা বেয়ে ওপরে উঠল।

BanglaBook.org

সুন্দর জানলা দিয়ে ভেতর দিকে নেমে পড়ল। গণেশ হালদার জিৎ আর বুড়িকে ওপরে উঠতে সাহায্য করল। তারপর এক-এক করে ওদের দুজনকে ভেতরে নামিয়ে দিল। শেষে নিজেও নেমে পড়ল।

॥ ষোলো ॥

ক্যামেরার রিল

জানলা দিয়ে ভেতর ঢুকেই বুড়ি বলে উঠল, 'এ তো দেখছি নাগরাজের গুহা!' জিৎ বলল, 'ঠিকই ধরেছিস। যার নাম ভুলকাভুলকি, তারই নাম নাগরাজের গুহা।'

জিৎ-এর কথা শেষ হল না নাগরাজের লোকেরা অস্ত্র হাতে তেড়ে এল ধর-ধর মার-মার করে।

গণেশ হালদাররা বুঝে নিল ওরা ফাঁদে পড়েছে। কিন্তু প্রফেসর কোথায় গেলেন? ওদের মনে পড়ল, ভেতরে ঢোকার সময় প্রফেসর কাছেপিঠে ছিলেন না।

প্রফেসর ঢিবির ওপর এতক্ষণ ফুল দেখছিলেন। ভেতরে গোলমাল শুরু হলে তার আওয়াজ ওঁর কানেও পৌঁছোল। উনি নেমে এসে ঢিবিটার পেছন দিকে জানলা দুটো দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ জানলার নীচে দাঁড়িয়ে গোলমাল শুনে উনি সেখান থেকে ফিরে যাওয়া স্থির করলেন।

ঢিবিটার ওপরে উঠে এসে উনি গাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছোনোর আগেই কালো রঙের গাড়ির আরোহীরা ওঁকে ঘিরে ধরল।

প্রফেসর লোকগুলোকে শুধোলেন, 'তোমরা কী চাও?'

ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা লোকটা বলল, 'আমরা তোমরা আসল পরিচয় জানতে চাই। আর সেই সঙ্গে আমাদের রিলটা ফেরত চাই।' প্রফেসরের মনে হল এই লোকটাই বোধহয় ওদের সর্দার।

প্রফেসর ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আমার পরিচয় সবাই জানে, আর তোমরা জান না? আমি প্রফেসর। নাম কল্লোল বিশ্বাস।'

'আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি কল্লোল বিশ্বাস নামে কোনো প্রফেসর পশ্চিমবাংলার কোনো কলেজে নেই।' ডোরাকাটা বলল।

'থাকবে কী করে? আমি তো চার বছর হল রিটায়ার করেছি।'

'তুমি কোথায় কোন কলেজে পড়াতে জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। আমি পড়াতাম নদীয়া জেলার নতুনগ্রাম কলেজে।'

নীল রঙের গেঞ্জি পরা লোকটা বলল, 'বাজে কথা। আমার বাড়ি নদীয়া জেলায়। সেখানে নতুনগ্রাম কলেজ বলে কোনো কলেজ নেই।'

BanglaBook.org

'অদ্ভুত যুক্তি তো! কোনো একটা জেলায় কারোর বাড়ি হলেই সে সেই জেলার সব কিছু জানে? নদীয়া জেলায় একসময় বৌদ্ধদের একটা নামকরা কেন্দ্র ছিল। সেই কেন্দ্রটা কোন জায়গায় বলো তো?'

'সে রকম কোনো বৌদ্ধকেন্দ্র নদীয়া জেলায় ছিল বলে শুনিনি।'

'তা হলে বুঝে নাও তুমি কত বড়ো মূর্খ! সেটা ছিল সুবর্ণবিহারে। কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ যাওয়ার পথে পড়ে। কাজেই তুমি যখন বলছ, তখন মেনে নিতে হচ্ছে, নদীয়া জেলায় নতুনগ্রাম কলেজ বলে কোনো কলেজই নেই। মূর্খদের কাছে অনেক কিছু থেকেও নেই, আবার না থেকেও আছে।'

নীল গেঞ্জি বলল, 'ঠিক আছে, আমি মূর্খ। তুমি একজন বিরাট পণ্ডিত। এখন ভালোমানুষের মতন আমাদের রিলটা ফেরত দাও তো।' বলেই সে প্রফেসরের দিকে হাত বাড়াল।

কালো গেঞ্জি আর ডোরাকাটা গেঞ্জি প্রফেসরের দিকে আরও এগিয়ে এল। ডোরাকাটা বলল, 'তোমার প্রফেসারি নিয়ে তুমি থাকো। কিন্তু আমাদের জগতে উঁকি মারার চেষ্টা করো না। এখন বুদ্ধিমানের মতন আমাদের রিলটা ফেরত দাও।'

'রিলটা এমন কী মূল্যবান জিনিস যে, ওটা ফেরত পাওয়ার জন্যে তোমরা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছ?' প্রফেসর জানতে চাইলেন।

'ওটায় আছে জলটুঙির অদৃশ্য মালিকের ছবি।' ডোরাকাটা বলল।

'সে আবার কে?'

'এখনও জানতে পারিনি।'

'জানার ব্যাপারে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারি। রিলটা আজ আমার কাছে থাক। কাল ফেরত পাবে।' বলেই প্রফেসর লাইটার জ্বেলে চুরোট ধরালেন।

'ওটি হবে না। রিলটা এখুনি আমাদের চাই।'

'বলছি তো, আজ পাবে না।'

'তা হলে আমরা জোর করেই কেড়ে নেব।' বলেই ডোরাকাটা তার সঙ্গী দুজনকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ইশারা করল।

প্রফেসর বললেন, 'জোর করেও পাবে না।' এই বলে উনি পকেট থেকে রিলটা বের করলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে রিলটা তার আগুনে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রফেসরের ওপর। ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা লোকটা প্রফেসরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল জ্বলন্ত রিলটা। তারপর হাতের মুঠোয় চেপে আগুনটা নিভিয়ে ফেলল। তার ডান হাতের পাতার চামড়া ঝলসে গেল।

প্রফেসর তখন অন্য দুজনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গাড়ির দিকে ছুটে গিয়ে সেটায় উঠে বসলেন। ওঁকে ধরার জন্য আততায়ীরা ছুটে এল। কিন্তু

BanglaBook.org

তার আগেই গাড়িটা ছেড়ে দিল। আততায়ীরা তখন নিজেদের গাড়িতে উঠে প্রফেসরকে তাড়া করল।

দুটো গাড়ি ছুটে চলল বেপরোয়াভাবে। গোঁসানীমারি পার হতেই প্রফেসরের গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল। আততায়ীরাও গাড়ি নিয়ে নেমে পড়ল সেখানে। হিন্দি ফিল্মের ঢঙে এমন দৃশ্য দেখতে পাকা রাস্তার ওপর অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য আততায়ীদের গাড়িটা মাঠের মধ্যে বিকল হয়ে পড়ল। তারা তখন গাড়ি থেকে নেমে প্রফেসরের গাড়িটাকে ধরতে ছুটল। প্রফেসর গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে এলেন। তারপর দিমহাটার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আততায়ীরা হাঁপাতে হাঁপাতে বড়ো রাস্তায় উঠে এল। উৎসুক জনতা ঘটনাটা জানার জন্য তাদের ঘিরে ধরল। একজন শুধোল, 'কী হয়েছে, দাদা?'

প্রশ্নের উত্তরে ডোরাকাটা গেঞ্জি বলল, 'একটা কুখ্যাত ডাকাতকে ধরার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু পারলাম না।'

জনতার ভেতর থেকে অন্য একজন প্রশ্ন করল, 'আপনারা কারা?'

ডোরাকাটা বলল, 'আমরা পুলিশের লোক। আপনারা কি দয়া করে আমাদের গাড়িটাকে রাস্তার ওপর তুলে দিতে পারবেন?'

জনতা উৎসাহের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল।

BanglaBook.org

॥ সতেরো ॥

রহস্যজনক ব্যাপার

গণেশ হালদার যখন দেখল কিছু সশস্ত্র লোক ওদের দিকে হৈহৈ করে এগিয়ে আসছে, তখন ও বুঝে নিল, লড়তে যাওয়ার মানে বিপদকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া। তাই ও ইশারায় জিৎ-বুড়িকে চুপ করে থাকতে বলল। কিন্তু মুশকিল বাধল সুন্দরকে নিয়ে।

যারা অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছিল, তাদের দলে বিষ্টু আর ঝন্টুও ছিল। ঝন্টুর নাকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ওদের চিনতে পেরেই সুন্দর এক লাফ দিয়ে ঝন্টুর কাঁধে চেপে বসল। তার নাকে একটা মোচড় দিয়ে ব্যান্ডেজটা খুলে নিয়েই উঠে গেল ওপরের জানলায়। সেখান থেকে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঘটল চোখের নিমেষে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই।

ঝন্টুর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল। নাক চেপে সে মেঝের ওপর বসে পড়ল। অন্যরা এসে বিনা বাধায় গণেশ হালদার, বুড়ি আর জিৎকে বেঁধে নিয়ে গেল নাগরাজের খাস কামরায়।

নাগরাজ গণেশ হালদারকে শুধোল, 'তোমরা আমার গুহায় কেন এসেছ?'

গণেশ হালদার বলল, 'এখানে তোমার গুহা আছে জানতাম না। আমরা এসেছিলাম ভুলকাভুলকি দেখতে।'

'তোমার সঙ্গের ছেলেমেয়ে দুটি পরশু এখানে বন্দী হয়ে ছিল। পরে আমার লোকেদের বেকুব বানিয়ে পালিয়ে যায়। আমার মনে হয় ওরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে।'

গণেশ হালদার বলল, 'তুমি যা খুশি ভাবতে পার। এখন বলো তো জলটুঙির বলহরি তালুকদারের সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?'

'স্রেফ লেনদেনের। তবে বলহরি নয়, আমার কারবার জলটুঙির আসল মালিকের সঙ্গে। অবিশ্যি তাকে কখনো চোখে দেখিনি। ত্রিশূল হচ্ছে তার সিমবল।'

'কপালীবাবার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?'

নাগরাজ বলল, 'না। কোনো বুজরুকের সঙ্গে আমি আলাপ করি নে। আমি যখন পুলিশে চাকরি করতাম, তখন থেকেই ওই জাতের লোকদের আমি এড়িয়ে চলি!'

'তুমি পুলিশে চাকরি করতে? ছাড়লে কেন?'

'ছাড়িনি, ছাড়িয়ে দিয়েছে। যখন জলপাইগুড়ির এস. পি. ছিলাম, তখন স্মাগলারদের দলে ভিড়ে যাই। ওপর মহলে জানাজানি হয়ে গেলে আমার চাকরি যায়, জেলও হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি লাইনে নেমে পড়ি। এ-লাইনের শের হচ্ছে চারজন। তার মধ্যে আমিও আছি।'

'অন্য তিনজন কারা?'

'ত্রিশূলধারী, পূজনলাল আর করিমভাই। করিমের বাড়ি বাংলাদেশে।'

'এদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?'

'পূজনলাল ছাড়া অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালোই। পূজনলালের সঙ্গে আমার আর ত্রিশূলধারীর ঝগড়া চলছে।'

'বলহরি তালুকদার তা হলে কে?'

'সে হচ্ছে ত্রিশূলধারীর সেঙাত। তার নামেই জলটুঙিতে কারবার চলে। লোকে জানে সে-ই হচ্ছে জলটুঙির মালিক। যাক গে, অনেক কথা বলে ফেললাম। তোমার সঙ্গের ছেলেমেয়ে দুটো খুবই চালাক। ওরা আমার লোকেদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।' নাগরাজ বলল।

জিৎ বলল, 'ভুল কথা! আমরা চোরের মতন পালিয়ে যাইনি। আপনার লোকেরাই আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল।'

নাগরাজ জিতের মিথ্যেকথাটা সত্যি বলে ধরে নিয়ে উচ্চারণ করল, 'তাই বলো! আমি ভাবছিলাম তোমরা এই ভুলকাভুলকি থেকে পালালে কী করে?

BanglaBook.org

এখানে ঢোকা গেলেও বেরোনো যায় না। পল্টন, তুমি এদের তিনজনকে এখন গারদঘরে আটক করে রাখো। বিষ্টু আর ঝন্টুকেও সেখানে আটকে রাখবে। বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।'

বিষ্টু আর ঝন্টু কিছু বলতে গেল। কিন্তু নাগরাজ তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল।

পল্টন ওদের পাঁচজনকে গারদঘরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরোজাটা বন্ধ করে তাতে শিকল এঁটে দিল।

জিৎকে বিষ্টু বলল, 'তুমি মিথ্যেকথা বললে কেন? তোমার জন্যে শুধু শুধু আমাদের শাস্তি পেতে হবে।'

জিৎ বলল, 'তোমাদের শাস্তি পেতে হবে না। আমাদের সঙ্গে তোমরাও এখান থেকে পালিয়ে যাবে।'

'কী ভাবে?' বিষ্টু জানতে চাইল।

এমন সময় সুন্দর বাইরে থেকে লাফিয়ে উঠল জানলার ওপর। জানলাটার দিকে আঙুল রেখে জিৎ বলল, 'ওই পথে।'

গণেশ হালদার বলল, 'জিৎ ঠিকই বলেছে। যদি বাঁচতে চাও, তা হলে আমাদের সঙ্গে পালিয়ে চলো। তোমরা কি ভালো হতে চাও না?'

বিষ্টু বলল, 'ভালো হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও উপায় কোথায়? নাগরাজ যে করেই হোক আমাদের খুঁজে বের করবে। তার দল থেকে পালিয়ে রেহাই পাওয়া যায় না।'

গণেশ হালদার বলল, 'আমি তোমাদের বাঁচাব। নাও, আর দেরি করো না। জিৎ, আগের কায়দায় তুমি আর বুড়ি জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাও। তারপর এরা দুজন বেরোবে। সবার শেষে বেরোব আমি।'

একে একে সবাই ভুলকাভুলকির বাইরে বেরিয়ে এল। বেলা তখন পড়ে এসেছে! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সূর্য ডুবে যাবে।

গোঁসানীমারি যাওয়ার মেঠো পথটা ঝন্টু আর বিষ্টুর জানা। সেই পথ ধরে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছে ওরা লোকের মুখে প্রফেসর বিশ্বাসের সঙ্গে গেঞ্জি পরা আততায়ীদের লড়াইয়ের খবর পেল। দিনহাটার বাস পাওয়া গেল না। কাজেই একটা ভ্যান-রিকশায় চড়ে গণেশ হালদাররা দিনহাটা থানায় হাজির হল।

থানায় এসে নীলাম্বর মজুমদারকে নাগরাজের গুহা অর্থাৎ ভুলকাভুলকির ঘটনাটা জানাতেই উনি তখনই এস. পি.-র মারফত কোচবিহার থেকে স্পেশাল পুলিশফোর্স চেয়ে পাঠালেন। আর গণেশ হালদারের পরামর্শ মতন নাগরাজ আর তার দলবলের ওপর নজর রাখার জন্য কয়েকজন কনস্টেবলকে ভুলকাভুলকিতে পাঠিয়ে দিলেন। তা ছাড়া প্রফেসর কল্লোল বিশ্বাসের খোঁজ নেওয়ার জন্য কোচবিহারের 'অলকা' হোটেলেও লোক পাঠালেন।

এরপর গণেশ হালদার একটা প্রাইভেট মোটরগাড়িতে চড়ে জলটুঙি রওনা

BanglaBook.org

হল। ওর সঙ্গী হল জিৎ, বুড়ি, সুন্দর, বিষ্টু আর ঝন্টু।

গণেশ হালদার পিংকি-রিংকিকে কথা দিয়েছিল শুক্রবার, ২০ অক্টোবর, রাত্তিরে ও জলটুঙিতে যাবে। সেটা সম্ভব হয়নি। আজ হচ্ছে শনিবার, ২১ অক্টোবর। সময় রাত ১০টা।

গাড়িতে যেতে যেতে জিৎ বলল, 'প্রফেসরকাকুর কোনো খবর তো পাওয়া গেল না। আততায়ীরা ওঁকে কিডন্যাপ করল কিনা, কে জানে?'

গণেশ হালদার নস্যি টেনে নাক মুছতে মুছতে বলল, 'কিডন্যাপ করলেও আমি তাঁকে খুঁজে বের করব। কেননা, জলটুঙির রহস্য-উদ্‌ঘাটনে তাঁকে আমার খুবই দরকার হবে।'

জলটুঙির কাছাকাছি গিয়ে গণেশ হালদার ড্রাইভারকে বলল, 'গাড়িটা একটু থামাও।' গাড়ি থামলে ও বলল, 'আমি, ঝন্টু আর বিষ্টু নেমে যাচ্ছি। তোমরা তিনজন গাড়িতে থাকবে। ড্রাইভারজি, গাড়িটাকে রাস্তা থেকে নীচে নামিয়ে অপেক্ষা করো। আলো জ্বালবে না।' এই বলে ও ঝন্টু আর বিষ্টুকে নিয়ে জলটুঙির দিকে এগোতে লাগল।

জলটুঙিতে কোনও আলো জ্বলছে না। গেটটাও বন্ধ। ভেতর দিকে একটা বড়ো তালা লাগানো। গণেশ হালদার দেখেশুনে বলল, 'এখন উপায়? রেলিং আর পাঁচিল দুই-ই তো খুব উঁচু দেখছি। রেলিং-এর ওপর আবার ইস্পাতের ধারালো ফলা। পাঁচিলের ওপরেও ভাঙা কাচ গাঁথা থাকতে পারে। পার হব কী করে?'

ঝন্টু বলল, 'উপায় আছে। কাছেই তো কত ঝোপঝাড়। পকেটেও ছুরি আছে। চল, বিষ্টু।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝন্টু আর বিষ্টু দু'বোঝা লতাপাতা নিয়ে এসে পাঁচিলের ওপরের কাচে গেঁথে দিল। তারপর তিনজনে একে একে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে চলে গেল। বিষ্টু আর ঝন্টুকে একটা ঝাউগাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে বলে গণেশ হালদার ফ্লোটিং ব্রিজটা পার হয়ে পিংকি-রিংকির ঘরে জানলার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রেন-পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে ওদের ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

পিংকি-রিংকি ঘুমিয়ে ছিল। গণেশ হালদার সাবধানে ওদের ডেকে তুলল। পিংকিকে শুধোল, 'কী ব্যাপার, আজ দেখছি সাঁঝরাতেই জলটুঙি নিঝুম!'

পিংকি জানাল বলহরির মেজাজ খুব খারাপ। কারো সঙ্গে কথা বলেনি। সদরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এর মানে, আজ রেস্তোরাঁ বন্ধ।

পিংকি আরও বলল, 'আজ একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটতে পারে। গত রাত্তিরে দুজন লোক এখানে এলে তাদের সঙ্গে বলহরি-দাদুর খুব ঝগড়া হয়। উনি তাদের এখানে আটকে রেখেছেন। আজ রাতে তাদের বিচার হতে পারে। সেই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা আসতে পারে। ওই তো, পেছনের দরোজায় নক হচ্ছে।

BanglaBook.org

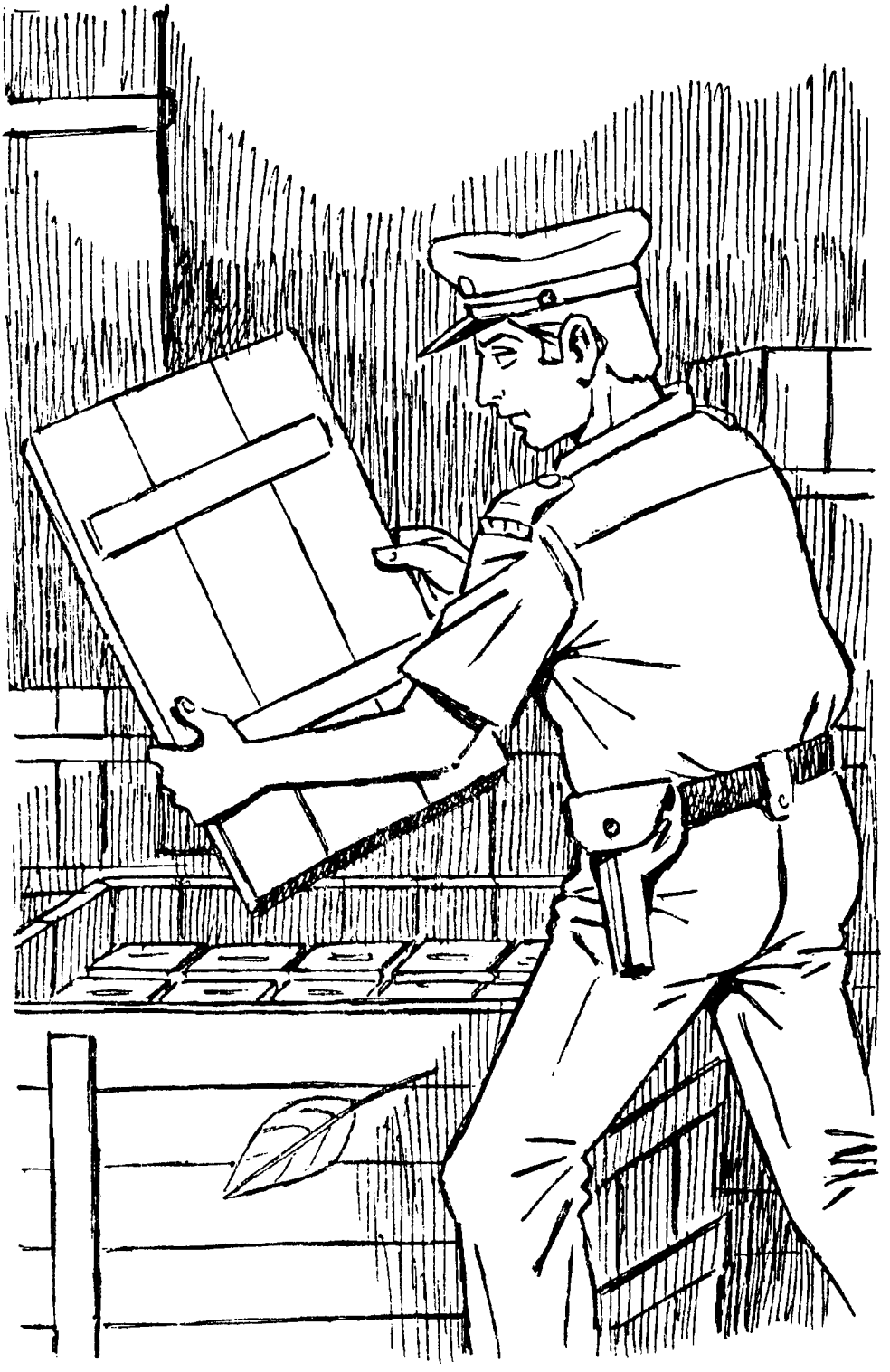

উনি পাতামার্কা একটা প্যাকিং বাক্স খুললেন।

লোকটা বোধ হয় এসে গেল।' এই বলে ও গণেশ হালদারকে পশ্চিমদিকের জানলার কাছে ডেকে নিয়ে গেল।

গণেশ হালদার দেখল পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা প্রায় ছ'ফুট লম্বা একটা লোক জলটুঙির পেছনের ভাসমান ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে দরোজায় নক করছে। একটু বাদে দরোজাটা কেউ খুলে দিতেই সে ভেতরে ঢুকে গেল। দরোজা বন্ধ করার শব্দ হল।

পিংকি গণেশ হালদারকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির দরোজাটার কাছে এসে বসল। রিংকিও এল।

সিঁড়ির দরোজাটা বন্ধ থাকলেও নীচে আলো জ্বলছে বোঝা গেল। পাল্লা দুটোর মাঝখানে অতি সামান্য ফাঁক। সেখানে চোখ রেখে নীচের ঘরের কিছুটা অংশ দেখা যায়। কিন্তু সেখানে ওরা কাউকেই দেখতে পেল না।

অনেকক্ষণ ওরা অপেক্ষা করে রইল। এরপর আলো নিভে গেল। পিংকি আর রিংকির সঙ্গে গণেশ হালদার বসেই রইল।

এমন সময় রাস্তার ওপর একটা মোটরগাড়ি থামার আওয়াজ হল। গণেশ হালদাররা পুবদিকের জানলার কাছে এসে দেখল গেটের সামনে একটা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ড্রাইভার পরপর চারবার হর্ন বাজাতেই বলহরি এসে গেট খুলে দিলেন। গাড়িটা থেকে মোট তিনজন লোক নেমে এল। এদের মধ্যে একজনের হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। অন্য দুজন তাকে ধাক্কা মারতে মারতে জলটুঙির মধ্যে নিয়ে গেল। বলহরিও গেট বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভেতরে আলো জ্বলল। অমনই একজন বলে উঠল, 'এই তো সেই বিশ্বাসঘাতক পল্টন! ওকে পেলে কোথায়?'

অন্য একজন বলল, 'কপালীবাবার আশ্রমের ধারে। ব্যাটার মতলব খারাপ ছিল। আপনি তো একেই চাইছিলেন?'

'চাইছিলামই তো। আমার নাম বলহরি তালুকদার। আমার দলে ঢোকা গেলেও বেরোনো যায় না। ও ভেবেছিল, নাগরাজের দলে ভিড়ে মোটা টাকা মুনাফা কামাবে। ওকে পেছনের দরোজা দিয়ে বের করে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দাও। ব্যাটা কতক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে, দেখা যাক।'

এরপর পেছনের দরোজাটা খোলার আওয়াজ হল। পিংকি গণেশ হালদারকে পশ্চিমদিকের জানলার কাছে নিয়ে গেল। চাঁদের আলোয় দেখা গেল পিছমোড়া করে বাঁধা লোকটাকে অন্য দুজন লোক ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল ভাসমান ব্রিজটার মাঝামাঝি জায়গায়। তারপর তাকে ঠেলা মেরে জলে ফেলে দিল। একটু পরেই জলের ভেতর প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু হল। তখন লোক দুটো আবার জলটুঙির ভেতরে চলে এল।

BanglaBook.org

পিংকি গণেশ হালদারকে শুধোল, 'পল্টন কে?'

গণেশ হালদার বলল, 'আগে বলহরির দলে কাজ করত। জলটুঙির অদৃশ্য মালিকের হুকুমে তোমাদের নীলছবি গাঁয়ে যায় ত্রিশূল-মার্কা চিঠি পৌঁছে দিতে। পরে পল্টন নাগরাজ নামে অন্য একজন চোরাচালানকারীর দলে যোগ দেয়। নাগরাজের হুকুমে আমাদের ওপর উৎপাত করার চেষ্টা করে।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। দুজনেই আমার সঙ্গে চলো।'

গণেশ হালদার রেন-পাইপ ধরে পিংকি-রিংকিকে একে একে নীচে নামিয়ে ঝন্টু-বিষ্টুকে ডেকে নিয়ে গাড়িটার কাছে এল। ড্রাইভারকে বলল, 'তোমরা এখানে লুকিয়ে থাকো। আমি একা গাড়িটা নিয়ে দিনহাটা থানায় যাব। ভোর হওয়ার আগেই পুলিশ-ফোর্স নিয়ে ফিরে আসব।'

জিৎ, বুড়ি, সুন্দর আর ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। গণেশ হালদার গাড়িতে উঠে সেটাকে পাকা রাস্তায় তুলে দিনহাটার দিকে চালিয়ে দিল।

॥ আঠারো ॥

রহস্যের খলনায়ক

দিনহাটা থানার অফিসার-ইন-চার্জ নীলাম্বর মজুমদার সময় নষ্ট করলেন না। ভোর হওয়ার আগেই উনি ভ্যান-ভর্তি পুলিশ-ফোর্স নিয়ে গণেশ হালদারের সঙ্গে জলটুঙি-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। তার আগে গণেশ হালদারের কথা মতন আর একটা ফোর্স পাঠিয়ে দিলেন ভুলকাভুলকিতে, নাগরাজকে দলবলসুদ্ধু গ্রেপ্তার করার জন্য।

জলটুঙির কাছেই নির্দিষ্ট জায়গায় জিৎরা গা ঢাকা দিয়ে ছিল। সেখানে এসে গণেশ হালদার শুনল একটু আগে জলটুঙির ভেতরে কয়েকবার গুলির আওয়াজ হয়েছে।

গণেশ হালদারের পরামর্শ অনুসারে নীলাম্বরবাবু পুলিশ দিয়ে জলাটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ফটক ভেঙে কয়েকজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে জলটুঙিতে ঢুকে পড়লেন। ওঁর সঙ্গে গেল গণেশ হালদার আর পিংকি। অন্যরা বাইরে থাকল।

সদর দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। গণেশ হালদার পিংকিকে পিঠে নিয়ে রেন-পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে জানলা দিয়ে পিংকির ঘরে ঢুকে পড়ল। ওর পেছনে নীলাম্বরবাবুও কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে সেখানে উঠে পড়লেন।

পিংকিদের ঘরের জিনিসপত্তর তছনছ করা। তা দেখে গণেশ হালদার বলল, 'কাল রাত্তিরে আমরা চলে যাওয়ার পর তোমার আর রিংকির খোঁজে কেউ একজন ঘরে ঢুকেছিল। তোমাদের না পেয়ে রেগেমেগে জিনিসগুলোর এই অবস্থা

BanglaBook.org

করেছে।'

পিংকি বলল, 'ভাগ্যিস আমরা আপনার সঙ্গে গিয়েছিলাম! তা না হলে আমরাও খুন হয়ে যেতাম।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'চলুন, মামার ঘরে যাওয়া যাক।' এই বলে ও সুশান্ত বিশ্বাসের ঘরের দিকে ছুটে গেল। গণেশ হালদাররা ওকে অনুসরণ করল।

সুশান্ত বিশ্বাসের ঘরের দরোজাটা খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকেই পিংকি ভয়ে-শোকে চিৎকার করে উঠল। গণেশ হালদাররা দেখল একটা লোক উপুড় হয়ে মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। তার পিঠে কেউ গুলি করেছে। রক্তের স্রোত বয়েছে মেঝের ওপর দিয়ে। গণেশ হালদার লোকটার নাড়ি পরীক্ষা করে বুঝল সে বেঁচে নেই। পিংকি জানাল এই ওর মামা সুশান্ত বিশ্বাস, বলহরি তালুকদারের জামাই।

পিংকি নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'এটা নিশ্চয়ই বলহরি-দাদুর কাজ। তাঁকে আমি ছাড়ব না।' এই বলে ও নীচে নামার জন্য ছুটে সিঁড়ির দরোজাটার কাছে চলে এল।

দরোজাটা ও-পাশ থেকে বন্ধ করা। নীলাম্বরবাবু লাথি মেরে সেটা ভেঙে ফেললেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দেখলেন রেস্তোরাঁর মেঝের ওপর দুটো লোক গুলি খেয়ে পড়ে রয়েছে। নাড়ি পরীক্ষা করে জানা গেল তারাও বেঁচে নেই। পিংকি জানাল এই লোক দুটোরই গত রাত্তিরে বিচার হওয়ার কথা ছিল।

'কিন্তু বলহরি কোথায়?' নীলাম্বরবাবু জানতে চাইলেন।

পিংকি পাশের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'এটায় থাকতে পারে।'

ঘরটার দরোজার জায়গায় রয়েছে শাটার। শাটারটা বন্ধ। নীলাম্বরবাবু পরীক্ষা করে বললেন, 'এটায় অটোমেটিক লক সিসটেম। টেনে নামিয়ে দিলেই আপনা থেকে এতে চাবি পড়ে যাবে। কিন্তু খুলতে গেলে চাবি লাগবে।'

পিংকি বলল, 'এই ঘরটার চাবি বলহরি-দাদুর কোমরে বাঁধা থাকে। আগে তাঁকে খুঁজে বের করা দরকার।' এরপর ও বলহরির শোয়ার ঘরে ঢুকে গিয়েই ভয়ে ভীষণ চিৎকার করে উঠল।

সবাই তখন সেখানে ঢুকে দেখল একটা দৈত্যের মতন প্রকাণ্ড লোক গলাকাটা অবস্থায় খাটের ওপর পড়ে রয়েছে! বিছানাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে! একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে তার ডান হাতের কাছে।

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'এই লোকটাই বলহরি। জলটুঙির বিভীষিকা। কিন্তু একে এ-ভাবে খুন করল কে?' বলতে বলতে উনি বলহরির কোমরের ঘুনসি থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিলেন। তারপর বললেন, 'একে খুন করা হয়েছে তরোয়াল জাতীয় কোনো অস্ত্র দিয়ে।'

BanglaBook.org

পিংকি বলল, 'রেস্তোরাঁর দেয়ালে খাপে ভর্তি একটা তরোয়াল ঝোলানো ছিল জানি। হয়তো সেটা দিয়েই এঁকে খুন করা হয়েছে।'

রেস্তোরাঁরা ঘরে এসে দেখা গেল নির্দিষ্ট জায়গায় তরোয়ালটা নেই। ঘরের অন্যখানেও সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

নীলাম্বরবাবু তখন গণেশ হালদারের ইঙ্গিতে শাটারটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। পর পর কয়েকটা চাবি পরখ করার পর একটা লেগে গেল। সেটা ঘোরাতেই শাটারটা খুলে গেল। উনি সেটা ওপরে উঠিয়ে দিলেন।

ঘরটার ভেতরে তিনজন লোক। গণেশ হালদারকে দেখেই তারা থতমত খেয়ে গেল। গণেশ হালদার এদের চেনে। গতকাল ভুলকাভুলকি-রাজপাট যাওয়ার পথে এদের সঙ্গে ওর মারামারি হয়েছে। পরে গোঁসানীমারিতে প্রফেসর বিশ্বাসের সঙ্গেও হয়েছে বলে শুনেছে।

লোক তিনজন অবাক ভাবটা কাটিয়ে উঠেই গণেশ হালদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। গণেশ হালদারের ঘুষি আর নীলাম্বরবাবুর লাথি খেয়ে শান্ত হল।

গণেশ হালদার শুধোল, 'তোমরা এখানে কেন?'

ডোরাকাটা গেঞ্জি পরা লোকটা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আমারও একই প্রশ্ন, তোমরা এখানে কেন?'

গণেশ হালদার বলল, 'আমরা এসেছিলাম বলহরিকে অ্যারেস্ট করতে।'

'আর আমরা এসেছিলাম বলহরির ওপর বদলা নিতে, ওকে খুন করতে।'

'তাকে খুন করতে এসেছিলে কেন?'

'ও আমাদের দলের কয়েকজনকে খুন করেছিল বলে।'

এবার নীলাম্বরবাবু শুধোলেন, 'তোমাদের দলের সর্দার কে?'

ডোরাকাটা বলল, 'নাম বললে চিনতে পারবেন?'

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'আমি প্রশ্নের জবাবে প্রশ্ন পছন্দ করি নে। উত্তর চাই।'

ডোরাকাটা বলল, 'আমাদের সর্দারের নাম পঞ্জনলাল।'

'এখানে এসেছিলি কেন?' নীলাম্বরবাবুর প্রশ্ন।

'বলেছি তো, বদলা নিতে।'

'তা হলে জলটুঙিতে গেল রাতে বলহরি সমেত যে-চারজন খুন হয়েছে, সেটা তোদেরই কাজ? ঠিক তো?'

'এখানে আমরা কাউকে খুন করিনি।'

'এই তো একটু আগে বললি তোরা বলহরিকে খুন করতে এসেছিলি। এখন আবার কথা ঘোরানো?' বলেই নীলম্বরবাবু ডোরাকাটার পেটে একটা লাথি মারলেন।

ডোরাকাটা মেঝের ওপর পড়ে গেল। দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে গেল। সে জোড়হাত করে বলল, 'আমরা খুন করতে এসেছিলাম বটে, তবে কাউকে খুন

BanglaBook.org

করিনি। তার আগেই আমরা এই শাটার-ঘরে আটকা পড়ি। বলহরি কায়দা করে আমাদের এই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই শাটারটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল।'

'চোপ রও! বিপদ বুঝে এখন গল্প তৈরি করা? মেরে তোকে ছাতু করে ফেলব।' এই বলে নীলাম্বরবাবু ডোরাকাটাকে আর একটা লাথি মারলেন তারপর কালো গেঞ্জি পরা লোকটাকে শুধোলেন, 'তোর গল্পটা বল।'

কালো গেঞ্জি বলল, 'অম্বরের কথাই ঠিক। বলহরি ভালোমানুষের মতন আমাদের জলটুঙিতে ঢুকতে দিয়ে এই শাটার-ঘরে নিয়ে আসে। তারপর আমরা কিছু করার আগেই সে শাটারটা টেনে দিয়েছিল। গত রাত্তিরে আমরা এখানে কাউকে খুন করিনি।'

'শাট আপ!' বলেই নীলাম্বরবাবু লোকটাকে একটা উড়ো লাথি মারলেন। লোকটা দাঁড়াবার শক্তি হারাল।

'এবার তোর গল্পটা বল।' নীল গেঞ্জি পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে নীলাম্বরবাবু প্রশ্ন করলেন।

নীল গেঞ্জি বলল, 'অম্বর আর গামা সত্যিকথাই বলেছে, হুজুর।'

'অম্বর আর গামা? তার মানে, ডোরাকাটার নাম অম্বর আর কালো গেঞ্জির নাম গামা। তোর নামটা কী?' শুধোলেন নীলাম্বরবাবু।

'আমার নাম কাসেম।' নীল গেঞ্জি বলল।

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'এবার আমার গল্পটা শোন। আমরা এখানে আসার আগে বলহরি সমেত যে-চারজন লোক খুন হয়, সেটা তোদেরই কাজ। কিন্তু পালানোর আগেই যখন দেখলি, আমরা জলটুঙিটা ঘিরে ফেলেছি, তখন তোরা লুকিয়ে থাকার জন্যে শাটার-ঘরে ঢুকে শাটারটা টেনে বন্ধ করে দিয়েছিলি। গল্পটা সত্যি না মিথ্যে?'

ডোরাকাটা বলল, 'আমাদের কথাই সত্যি, হুজুর।'

নীলাম্বরবাবু লোকটাকে ফের লাথি মারার জন্য পা উঁচিয়ে বললেন, 'আর আমার গল্পটা মিথ্যে?'

গণেশ হালদার ইশারায় নীলাম্বরবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি দেখছি। এই যে অম্বর, তুমি নাগরাজ বলে কাউকে চেন?'

অম্বর বলল, 'নাম শুনেছি। সে আমাদের রাইভাল গ্রুপের মাথা। বলহরির সঙ্গে তার কারবার।'

'তার ডেরা কোথায় জান?'

'শুনেছি এই অঞ্চলেই কোথাও। সন্ধান পেলে বোমা মেরে তার ডেরাটা উড়িয়ে দেব।'

গণেশ হালদার বলল, 'সে-কাজটা পরে করলেও চলবে। বলহরি তালুকদারের খুনিকে আগে খুঁজে বের করতে হবে। ভালো কথা, প্রফেসর কল্লোল বিশ্বাসের

BanglaBook.org

খবর জান? শুনলাম কাল বিকেলে প্রফেসরের সঙ্গে তোমাদের মারামারি হয়েছিল।'

কাসেম বলল, 'প্রফেসর না হাতি! প্রফেসর হলে আমাদের ক্যামেরার রিলটা গাপুস করতে চায়?'

গণেশ হালদার বলল, 'নাই বা হলেন তিনি প্রফেসর। তোমরা তো কাল বিকেলে তাঁর সঙ্গে মারামারি করেছিলে! গোঁসানীমারির অনেকে সাক্ষী দেবে। এখন বলো, তিনি কোথায় গেলেন?'

অম্বর বলল, 'সেই সাক্ষীরাই বলবে, আমাদের গাড়িটা বিকল হয়ে যাওয়ার সুযোগে তিনি আমাদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন বা এখন কোথায় আছেন, তা বলতে পারব না। তবে আমাদের সৌভাগ্য, ক্যামেরার রিলটা তিনি নিয়ে যেতে পারেননি।' একটু থেমে ও ফের বলল, 'এই রিলে এমন কয়েকটা দামি ছবি আছে, যা দেখে হয়তো বলহরির আততায়ীকে সনাক্ত করা যেতে পারে।' এই বলে সে সামান্য পুড়ে যাওয়া রিলটা পকেট থেকে বের করে সবার চোখের সামনে খুলে ধরল।

পিংকি রিলটা চেয়ে নিয়ে টিউব লাইটের আলোয় ধরল। কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'এতে তো দেখছি সেই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটার কয়েকটা ছবি রয়েছে। তা ছাড়া কপালীবাবারও দুটো ছবি রয়েছে দেখছি।'

গামা বলল, 'আপনারা যাকে প্রফেসর বলেন, তার ছবিও আছে। আমি ছবিগুলো নেগেটিভ থেকে আগেই তুলে রেখেছি। অম্বর বা কাসেম জানে না। এই দেখুন।' বলেই পকেট থেকে একটা খাম বের করে তা থেকে ছবিগুলো বের করে গণেশ হালদারের দিকে বাড়িয়ে ধরল।

গণেশ হালদার অনেকক্ষণ ধরে ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল। তারপর বলে উঠল, 'ক্লু পাওয়া গিয়েছে।'

নীলাম্বরবাবু ছবিগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করার পর বললেন, 'তোমার ক্লুর কিছু বুঝলাম না।'

গণেশ হালদার বলল, 'নীলাম্বর, আর দেরি নয়। এদের তিনজনকে আপাতত এখানে রেখে এখুনি কপালীবাবার আশ্রমে যেতে হবে।'

অম্বর বলল, 'জলটুঙির অদৃশ্য মালিক যদি বলহরির মার্ডারার হয়, তাকে কেবল পুলিশ দিয়ে ধরা যাবে না। আমাদের সাহায্যও দরকার হবে।'

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'বেশ তো, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চলো। বেগড়বাই করলে কিন্তু লাথি খেতে হবে। আমার নাম নীলাম্বর মজুমদার। লাথি মেরে তোমাদের মতন অনেক ক্রিমিনালকে টিট করে দিয়েছি।'

BanglaBook.org

॥ উনিশ॥

খলনায়কের কী হল?

কপালীবাবার আশ্রমে যাওয়ার আগে নীলাম্বরবাবু জলটুঙিতে পুলিশ পোস্টিং করতে ভুললেন না। পথে জিৎরা গণেশ হালদারের কাছে বায়না ধরল ওরাও কপালীবাবার আশ্রমে যাবে। বিষ্টু আর ঝন্টুও যেতে চাইল।

এ-সময় একটা রিকশায় চড়ে দিনহাটার নিমাই আর নিতাই আসছিল পিংকিদের সঙ্গে দেখা করতে। রিকশাচালক সেই কিংশুক, যার রিকশায় চড়ে পিংকি-রিংকি প্রথম দিন জলটুঙিতে এসেছিল। রাস্তায় পিংকিকে দেখেই এরা থেমে গেল। তারপর পিংকির মুখ থেকে সব কথা শুনে এরাও কপালীবাবার আশ্রমে যেতে চাইল।

পিংকি বলল, 'আশ্রমের দুটো গেট আছে। একটা সামনে, রাস্তার দিকে। অন্যটা পিছনে, নদীর দিকে। আগে সামনের গেট দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করতে হবে।'

ওরা সামনের গেটে এসে দেখল সেটা ভেতর থেকে তালা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও কারোর সাড়া পাওয়া গেল না। পিংকি তখন গণেশ হালদার আর জিৎকে নিয়ে পেছন দিকের গেটে চলে এল। এই গেটটাও ভেতর থেকে বন্ধ। ওদের সঙ্গে সুন্দরও এসেছিল। সুন্দর লাফ দিয়ে পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে গিয়ে গেটটা খুলে দিতেই ওরা তিনজন আশ্রমের ভেতর ঢুকে গেল।

ওদিকে নীলাম্বরবাবু বিষ্টু, ঝন্টু, অম্বর, গামা আর কাসেমের সাহায্যে আশ্রমের সদর গেটটা ভেঙে দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। আশ্রমের সব কটা ঘর খোঁজা হল। কোনও লোককেই পাওয়া গেল না। ওরা চলে এল মন্দিরের সামনে। মন্দিরের দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। নীলাম্বরবাবু মন্দিরের দরোজায় ধাক্কা দিতে দিতে বললেন, 'এই, ভেতরে কে আছো? শীগগির দরোজা খোলো।' কিন্তু ভেতর থেকে কেউ-ই সাড়া দিল না। দরোজাও খুলল না।

নীলাম্বরবাবুর নির্দেশে বিষ্টুরা মন্দিরের দরোজাটা ভেঙে ফেলল। না, মন্দিরের ভেতরেও কেউ নেই।

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার! ভেতর থেকে যে-লোকটা মন্দিরের দরোজা বন্ধ করেছিল, সে কোথায় গেল?'

বুড়ি বলল, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

জিৎ বলল, 'নিশ্চয়ই কোনো কৌশল আছে।'

রিংকি বলল, 'এখন কী হবে?'

গণেশ হালদার মন্দিরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'এখন কেবল মা-কালী ভরসা।'

মন্দিরের মাঝখানে সিমেন্টের তৈরি একটা বেদি। সেটার আয়তন পাঁচ ফুট

BanglaBook.org

বাই পাঁচ ফুট। বেদিটার ওপরে একটা কাঠের পাটাতন। সেই পাটাতনের ওপর কালো পাথরের কালীমূর্তি। পায়ের নীচে শায়িত মহাদেব। এটি শ্বেতপাথরের তৈরি। মহাদেব সমেত মূর্তিটি পৌনে দু'হাত উঁচু।

গণেশ হালদার মূর্তিটিকে দু'হাত দিয়ে ধরে বেদি থেকে তুলে মেঝের ওপর নামানোর চেষ্টা করল। মূর্তিটি কাঠের পাটাতনের সঙ্গে আটকানো ছিল, তোলা গেল না। এ-সময় নীলাম্বরবাবু আর অন্যরা গণেশ হালদারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। কিন্তু তাতেও কাজ হল না। সবাই হাল ছেড়ে দিলে জিৎ বলল, 'আমি একবার চেষ্টা করব?' নীলাম্বরবাবু হাঁপাচ্ছিলেন। বললেন, 'চেষ্টা করতে দোষ কী?'

জিৎ প্রথমে কাঠের পাটাতনটাকে সামনের দিকে টানার চেষ্টা করল। তাতে কাজ হল না। তারপর সেটাকে পেছন দিকে ঠেলার চেষ্টা করল। তাতেও ফল পেল না। এরপর সেটাকে বাঁদিকে সরাতে গেল। পারল না। শেষে ডানদিকে সরাতে গেল। এতে কাজ হল। মূর্তি সমেত কাঠের মোটা-শক্ত পাটাতনটা খানিকটা সরে যেতেই তার নীচে একটা সিঁড়ি দেখা গেল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে নামল গণেশ হালদার। ওর পেছনে সুন্দর, জিৎ, পিংকি, তারপর বিষ্টু, ঝন্টু, অম্বর, গামা, কাসেম, নিমাই, নিতাই আর কিংশুক। এরপর নামলেন নীলাম্বরবাবু। বুড়ি আর রিংকি থেকে গেল। দুজন কনস্টেবলের ওপর ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রইল।

মন্দিরের নীচে দুটো ঘরে থরে থরে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটা প্যাকিং বাক্স। সেগুলোর কোনওটর গায়ে রঙ দিয়ে আঁকা রয়েছে ফুল, কোনওটার গায়ে পাতা।

নীলাম্বরবাবু প্রথমে ফুলমার্কা একটা প্যাকিং বাক্স খুলে ফেললেন। সেটায় পাওয়া গেল অষ্টধাতুর তৈরি রাধাকৃষ্ণের একটা যুগলমূর্তি। এরপর উনি পাতামার্কা একটা প্যাকিং বাক্স খুললেন। এটা ভর্তি রয়েছে সোনার বাটে।

তিন নম্বর ঘরটায় পাওয়া গেল সোনা গলানোর সরঞ্জাম। সেগুলো দেখেই গণেশ হালদার বলে উঠল, 'পিংকি মা, তোমার কপালীবাবার ওয়ার্কশপ দেখছ তো! এখন বুঝে নাও, তিনি কত বড়ো কালীসাধক!' এরপর ও খুঁজে পেল একটা ওয়র্ডরোব। এর মধ্যে আছে ধুতি-পাঞ্জাবি-পায়জামা থেকে শুরু করে গেরুয়া রঙের ফতুয়া-লুঙ্গি-আলখাল্লা। নকল দাড়ি-গোঁফ-চুল থেকে ছাইভস্ম আর রুদ্রাক্ষের মালা। ওয়র্ডরোবের নীচে পাওয়া গেল দু'জোড়া কাঠের খড়ম আর তিনজোড়া চামড়ার পাম্প-শু। গণেশ হালদার পরীক্ষা করে দেখল জুতো বা খড়মের প্রত্যেক জোড়ার বাঁ-পায়ের গোড়ালির অংশ ডান-পায়ের চাইতে আধ-ইঞ্চি মতন বেশি উঁচু।

নীলাম্বরবাবু শুধোলেন, 'কী দেখছ?'

গণেশ হালদার বলল, 'খলনায়কের সাজ-পোশাক।'

BanglaBook.org

'কিন্তু মহাপুরুষ গেলেন কোথায়? মন্দিরে ঢুকেই হাওয়া হয়ে গেলেন?' নীলাম্বরবাবু বললেন।

গণেশ হালদার বলল, 'ধৈর্য হারাচ্ছ কেন? সাপের গর্ত যখন পেয়েছি, সাপকেও পাব। কেবল দেখতে হবে অসাবধানে সাপের লেজে যেন পা না পড়ে।' এই বলে ও একটা বন্ধ দেয়াল-আলমারির পাল্লাদুটো টেনে খুলে ফেলল। তার আগে ঘরের মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা লম্বা নাইলনের দড়ি ও কুড়িয়ে নিল। পাল্লা দুটো খুলতেই পাওয়া গেল একটা সুড়ঙ্গ-পথ। সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা বুঝতে পারল পথটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে। ওরা এগোতে লাগল। গণেশ হালদারের একহাতে জ্বলন্ত টর্চ, অন্যহাতে নাইলনের দড়ি।

নীলাম্বরবাবু গণেশ হালদারের হাতে নাইলনের দড়ি দেখে শুধোলেন, 'ওটা কী কাজে লাগবে?'

গণেশ হালদার বলল, 'এ-সব সুড়ঙ্গ-পথে কোনটা কী কাজে লাগে, বলা যায় না। একটা শাবল পেলে আরো ভালো হত। এই দেখো, সুড়ঙ্গের ছাদটা ফুটো। কিন্তু এত উঁচুতে যে শুধু এই দড়ি দিয়ে কাজ হবে না। তবে ফুটোটা থাকার দরুন সুড়ঙ্গের বাতাস দূষিত হতে পারেনি।'

পথটার শেষ মাথা জলে ডুবে আছে। এরপর এগোনো মুশকিল।

পিংকি বলল, 'এখন কী হবে?' অন্যদেরও একই প্রশ্ন।

যেখান থেকে জল শুরু হয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ হালদার সামনের দিকে টর্চের আলো ফেলে দেখল, কিছুটা দূরেই সুড়ঙ্গ-পথটার ছাদ পর্যন্ত জল পৌঁছে গিয়েছে। কাজেই ভাববার বিষয়। একটু ভেবে ও বলল, 'উপায় হয়তো আছে। আগে আমি জলে নামছি। হাতের এই দড়িটা এখন কাজে লাগাব।' এই বলে ও দড়িটার একটা মাথা নিজের কোমরে বেঁধে অন্য মাথাটা নীলাম্বরবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমি যদি খুব জোরে দড়িতে টান দিই, তাহলে তোমরা আমাকে টেনে নিয়ে আসবে। আর যদি দড়িটা ছেড়ে দিই, তাহলে বুঝে নেবে আমি ডাঙায় উঠেছি। তোমরা তখন একে একে আমার কায়দায় ওপারে যাবে। যারা সাঁতার বা ডুবসাঁতার জান না, তারা ফিরে যাও।' বলেই ও জলে নামতে লাগল।

জল ক্রমশ গভীর হতে লাগল। শেষে এমন অবস্থা হল, গণেশ হালদারের গলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। তারপর মাথাটাও ডুবতে চলল। ছাদ পর্যন্ত জল থাকার দরুন ভেসে সাঁতার কাটা অসম্ভব। তাই ও ডুবসাঁতার দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে নীলাম্বরবাবু দেখলেন ওঁর হাতে ধরা দড়িটা ওপাশে আলগা হয়ে গিয়েছে। উনি তখন দড়িটা টেনে নিয়ে জিতের কোমরে বেঁধে দিলেন। জিতের কোলে রইল সুন্দর। ওদের পর একে একে বিষ্টু, পিংকি, ঝন্টু, অম্বর, গামা, কাসেম, নিমাই,

BanglaBook.org

নিতাই আর কিংশুক পার হয়ে গেল। সবার শেষে পার হলেন নীলাম্বরবাবু। ওঁর পনেরো বছরের পুলিশ-জীবনে এ-রকম অভিজ্ঞতা প্রথম।

সুড়ঙ্গ-পথটা উল্টানো ধনুকের মতন বাঁকা। ক্রমশ নিচু হয়ে আবার ক্রমশ উঁচু হয়েছে। এ-পারে মন্দির। মাঝখানের বাঁকা অংশে জল। ওপারে ফের ডাঙা। ক্রমশ উঁচু হয়ে সেটা শেষ হয়েছে একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে। অতীতের হয়তো এটা কোনও রাজার বাড়ি ছিল।

বাড়িটার ওপরে মাটির ঢিবি। নীচে বেশির ভাগ ঘরই বসবাসের অযোগ্য। কেবল গোটা দুয়েক ঘর আস্ত আছে।

ওপর থেকে বোঝবার জো নেই, ঢিবিটার নীচে একটা বাড়ি চাপা পড়ে রয়েছে। ঢিবিটাও চোখে পড়ে না। কেননা, এটা গভীর-দুর্গম বনের মধ্যে অবস্থিত। বিনা কাজে এই বনে কেউ কখনও আসে না। এমন কী আদিবাসীরাও এখানে শিকার করতে আসে না। তাদের বিশ্বাস, এই বনে ভূতেরা বাস করে। লোকের মুখে মুখে বনটার নাম হয়েছে ভূতের বন।

বনটার পশ্চিমদিক দিয়ে বয়ে গিয়েছে ধরলা নদী। বন থেকেই তার গান শোনা যায়।

অতীতে কোনও রাজা বা জমিদার এ-বাড়িতে যখন বাস করতেন, তখন তাঁদের আরাধ্য দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল সুড়ঙ্গের ও-মাথায় অবস্থিত মন্দিরটায়। তখনকার সেই মূর্তিটা পাওয়া যায়নি।

গণেশ হালদার জেনেছে, মন্দিরটা বহুদিন মানুষের চোখের আড়ালে পড়ে ছিল। কয়েক বছর আগে কপালীবাবা যখন এখানে এসে আশ্রমটা তৈরি করেন, তখন মন্দিরটাকেও সংস্কার করে নেন। তারপর প্রতিষ্ঠা করেন কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি।

গণেশ হালদাররা একে একে পড়োবাড়িটার একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল। বাড়িটার ভেতরে অন্য একটা ঘরে তখন লোক ছিল। কেননা, তাদের কথাবার্তা ওদের কানে আসছিল। ওরা সেখানে ওত পেতে বসে থেকে লোকগুলোর কথাবার্তা শুনতে লাগল।

লোকগুলোর একজন বলল, 'সাধুবাবা, ভিজে পোশাকে কতক্ষণ এখানে থাকব?'

সাধুবাবা বলল, 'স্মাগলারের দলে ভিড়ে ভিজে পোশাক নিয়ে অভিযোগ করতে নেই। কি জামাল, তুমি কি বল?'

জামাল বলল, 'পোশাক ভিজে থাকলে ক্ষতি নেই কিন্তু খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কী হবে?'

সাধুবাবা বলল, 'খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই বনে প্রচুর খরগোশ আর শজারু আছে। হরিয়াল পাখিরও অভাব নেই। বেশ কয়েকটা ফলের গাছও আছে। নারকেল গাছ তো আছেই। কাজেই খাবারের জন্যে চিন্তা কী? নিশ্চিন্তে ঘুমোনোর

BanglaBook.org

মতন এরকম একটা নিরিবিলি জায়গা আর কোথাও পাবে না। পুলিশের কথা তো ছেড়েই দিলাম, গণেশ হালদারও আমাদের খুঁজে পাবে না।'

একজন বলল, 'ওরা যদি মূর্তি আর সোনার বাটগুলো খুঁজে পায়? মন্দিরের দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে আসা ভুল হয়েছে।'

জামাল বলল, 'কার্তিক ঠিক কথাই বলেছে, সাধুবাবা।'

সাধুবাবা বলল, 'তোমরা এত দুর্ভাবনা করছ কেন? মা-কালীর কৃপা থাকলে কেউ কিছু খুঁজে পাবে না। জানো তো, মা-কালী চিরকালই ডাকাতদের পক্ষে।'

নীলাম্বরবাবু আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। খোলা রিভলভার হাতে নিয়ে আচমকা পাশের ঘরের দরোজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'মা-কালী তোমাদের পক্ষে থাকতে পারেন, কিন্তু পুলিশ চিরকাল তোমাদের বিপক্ষে। এখন তোমরা সবাই ভালো ছেলের মতন হাতগুলো মাথার ওপর তুলে—।'

নীলাম্বরবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা ভারী জিনিস এসে ওঁর রিভলভার ধরা হাতে লাগল। রিভলভারটা ছিটকে মেঝের ওপর পড়ার আগেই তা থেকে একটা গুলি বেরিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে লাগল।

এই সুযোগে স্মাগলাররা অন্য একটা দরোজা দিয়ে পালিয়ে গেল। নীলাম্বরবাবু রিভলভারটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাদের তাড়া করলেন। গণেশ হালদার আর অন্যরা ওঁকে অনুসরণ করল।

স্মাগলারদের তাড়া করে নীলাম্বরবাবুরা উপস্থিত হলেন নদীর ধারে। স্মাগলাররা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীলাম্বরবাবু সঙ্গীদের হুকুম করলেন, 'জলে নেমে ওদের ধরো।' সঙ্গে সঙ্গে সকলে নেমে পড়ল জলে। শুধু পিংকি আর সুন্দর নামল না।

সাধুবেশী সর্দার ও-পারে উঠতে পারে এটা অনুমান করে গণেশ হালদার আগেই সাঁতার কেটে ও-পারে গিয়ে উঠল। সর্দার ওঁকে দেখেনি। তাই সে ডাঙায় উঠেই ছুটতে লাগল।

সর্দারের বাঁ-পা ডান-পায়ের চাইতে সামান্য ছোটো। হয়তো এই কারণে তার দৌড়োতে অসুবিধা হচ্ছিল। গণেশ হালদার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু সর্দার ধরা দিয়েও দেয় না। প্রথম সুযোগেই সে জুডোর প্যাঁচে গণেশ হালদারকে চিত করে ফেলল। গণেশ হালদার পাল্টা প্যাঁচে লোকটাকে দু-পায়ের জোড়া লাথির সাহায্যে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সে মাটিতে পড়ার আগেই গণেশ হালদার তাকে ঘুঁষি মারতে গেল। ঘুঁষিটা কিন্তু ফসকে গেল। লোকটা মাটিতে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়েই ডান-পায়ের লাথিতে গণেশ হালদারকে ফেলে দিল। তারপর সে গণেশ হালদারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দুজনের ধস্তাধস্তি চলতে লাগল। সমানে সমানে লড়াই। অবশেষে দুজনে জড়াজড়ি অবস্থায় গড়াতে গড়াতে নদীর জলে এসে পড়ল। এবার লোকটা

BanglaBook.org

সহজেই কাবু হয়ে পড়ল। কেননা, সে ভালো সাঁতার জানে না।

লোকটা নিস্তেজ হয়ে পড়লে গণেশ হালদার তাকে পিঠে নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে এ-পারে এসে উঠল। তারপর পিংকিকে জিগ্যেস করল, 'কী, সাধুবাবাকে চিনতে পারছ?'

পিংকি বলল, 'কেন পারব না? ইনিই তো কপালীবাবা।'

কপালীবাবা আগুন-চোখে পিংকির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই মেয়েটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া। ওরা দু'বোন যদি জলটুঙিতে না আসত, কারোর সাধ্য ছিল না আমাকে ছোঁয়ার।'

গণেশ হালদার কপালীবাবার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগল, 'এঁর প্রতীক হচ্ছে ত্রিশূল। ত্রিশূলের ছবি আঁকা হুমকি-চিঠি পাঠিয়ে ইনিই তোমাদের জলটুঙিতে আসতে বারণ করেছিলেন। যাকেই এঁর পছন্দ হত না, তাকেই ইনি ত্রিশূল-মার্কা হুমকি-চিঠি পাঠাতেন।'

'পাঠাতাম. বেশ করতাম।' কপালীবাবা বললেন।

'এঁর বাঁ-পাটা ডান-পায়ের চাইতে প্রায় আধ ইঞ্চি ছোট। তাই এঁর বাঁ-পায়ের জুতো বা খড়ম ছিল ডান-পায়ের চাইতে বেশি উঁচু।' গণেশ হালদার বলতে লাগল, 'জুতো বা খড়ম পরা অবস্থায় পা-দুটোর ছোটো-বড়ো বোঝা যায় না। কিন্তু ইনি যখন নরম মাটিতে কিংবা বালির ওপর দিয়ে হাঁটেন, তখন সেখানে বাঁ-পায়ের গোড়ালির ছাপ ডান-পায়ের গোড়ালির চাইতে গভীরভাবে পড়ে। সেই ছাপ দেখে মনে হতে পারে, ইনি বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে বেশি ভর দিয়ে হাঁটেন।'

পিংকি বলল, 'ইনিই কি তাহলে সেই পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা লোক, যিনি বলহরি-দাদুর ওপর খবরদারি করতেন?'

'হ্যাঁ, ইনিই হচ্ছেন জলটুঙির আসল মালিক। কেউ কেউ এঁকে বলে জলটুঙির অদৃশ্য মালিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইনি অদৃশ্য থাকতে পারলেন না।' গণেশ হালদার বলল।

কপালীবাবা বললেন, 'পারতাম, এই মেয়েটা যদি জলটুঙিতে না আসত। এ-রকম বিচ্ছু মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।'

ইতিমধ্যে নীলাম্বরবাবু, জিৎ আর অন্যরা মিলে কপালীবাবার দলের লোকেদের ধরে ডাঙায় তুলেছেন। একটু বাদে নীলাম্বরবাবুরা তাদের মার্চ করিয়ে গণেশ হালদারের কাছে নিয়ে এলেন। নাইলনের লম্বা দড়িটা দিয়ে তাদের প্রত্যেকের কোমর পর পর বাঁধা হল।

গণেশ হালদার কপালীবাবাকে দেখিয়ে জিৎকে বলল, 'এঁকে চিনতে পারছ তো?'

জিৎ বলল, 'ইনি কে?'

গণেশ হালদার বলল, 'সাধুবেশে ইনি কপালীবাবা। বেশ খুললে ইনি—।'

'এই দেখো, আমি কে।' এই বলে কপালীবাবা নকল দাড়ি-গোঁফ আর জটা

BanglaBook.org

খুলে ফেললেন।

'আরে, ইনিই তো সেই প্রফেসর, যাঁর নাম কল্লোল বিশ্বাস!' জিৎ বলল। ওর কথায় বিস্ময়ের সুর।

গামা বলল, 'আমরা আগেই এঁর স্বরূপ জেনে গিয়েছিলাম। ইনি যে প্রফেসর নন, তা বুঝে নিয়েছিলাম।'

'তুমি থামো।' কপালীবাবা গামাকে ধমক দিয়ে উঠলেন।

গণেশ হালদার বলল, 'আমি আগেই কিছুটা অনুমান করেছিলাম। বিশেষ করে ইনি যেদিন আমাদের রাজপাট দেখানোর ছল করে নাগরাজের গারদে ঢোকানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, সেদিন। কী, প্রফেসর, ঠিক বলছি তো? আমাদের ভুলকাভুলকি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার পেছনে কি আপনার কোনো মতলব ছিল না?'

প্রফেসর ওরফে কপালীবাবা বললেন, 'নিশ্চয়ই ছিল। তোমরা যাতে ভুলকাভুলকিতে ঢুকে নাগরাজের লোকেদের হাতে বন্দী হও, এটাই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু নাগরাজটা এমন গাড়ল যে, তোমাদের সেখানে আটকে রাখতে পারল না। ব্যাটা পয়লা নম্বরের নির্বোধ। তাকে হাতের কাছে পেলে পিষে মারতাম।'

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'তাকে পিষে মারার জন্যে আমি আছি। তোমাকে আর কষ্ট করতে দেব না।'

গণেশ হালদার বলল, 'গামা, তুমি যে ছবিগুলো আমাকে দেখিয়েছিলে, সে-গুলো জলটুঙির আসল মালিককে সনাক্ত করাতে খুবই কাজে লেগেছে। দাড়ি-গোঁফ দিয়ে ইনি ডানদিকের গালের কাটা দাগটা ঢেকে রাখলেও কপালের কাটা দাগটা লুকোতে পারেননি।'

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'প্রফেসর কল্লোল বিশ্বাস যে জলটুঙির খলনায়ক হতে পারেন, এটা কখনো মনে আসেনি। তা হলে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হত না।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, কাল রাত্তিরে জলটুঙিতে যে-সব লোক খুন হয়েছে, সেটা এঁর কাজ কি না।'

প্রফেসর বললেন, 'হ্যাঁ, আমারই কাজ। এখন যা করতে হয় করো।'

'আপনি তাদের খুন করলেন কেন?' নীলাম্বরবাবু জানতে চাইলেন।

'তারা যাতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে না পারে, সে-জন্যে।' প্রফেসর বললেন।

গণেশ হালদার শুধোল, 'আপনি যে-অস্ত্রটা দিয়ে বলহরির মুন্ডু কেটেছেন, সেটা কোথায়, বলবেন কি?'

প্রফেসর বললেন, 'নিশ্চয়ই বলব। তবে জায়গাটায় আমাকে নিয়ে যেতে হবে।'

গণেশ হালদার বলল, 'সেটা কোথায়?'

BanglaBook.org

প্রফেসর বললেন, 'জলটুঙিতে।'

সুন্দর প্রফেসর বিশ্বাসের কথাগুলো ধরে রাখার জন্য তার গলায় ঝোলানো টেপ-রেকর্ডারটা চালু করে রেখেছিল। এখন সেটা বন্ধ করে দিল।

নদীর ধার দিয়ে পথ। পিংকি সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগে আগে চলল।

খানিকক্ষণ চলার পর বাঁ হাতে প্রথমে পড়ল কপালীবাবার আশ্রম। এর কিছুক্ষণ পরেই পড়ল জলটুঙির বন। বনের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা সরু পথ। বনের পরেই জলা। সেই জলার ওপর ভাসমান সেতু, যেটা চলে গিয়েছে জলটুঙির মূল বাড়িটা পর্যন্ত।

সেতুতে ওঠার মুখেই দুজন কনস্টেবলকে দেখা গেল। নীলাম্বরবাবুকে দেখেই তারা সেলাম জানিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। এরপর একে একে সবাই ভাসমান ব্রিজের ওপর এসে উঠল।

এ-সময় প্রফেইর বিশ্বাস গণেশ হালদারকে বললেন, 'তুমি আর দারোগাসাহেব ব্রিজের ওপর থাকো। অন্যদের জলটুঙির ভেতরে যেতে বলো। বিদায়ের সময় তোমাদের দুজনকে তিনটে দরকারি কথা বলে যাব।'

অন্যরা নীলাম্বরবাবুর ইঙ্গিতে জলটুঙির ভেতরে চলে গেল। সবাই চলে গেলে নীলাম্বরবাবু প্রফেসরকে শুধোলেন, 'বলহরিকে যে-অস্ত্রটা দিয়ে খুন করেছেন, সেটা কোথায়?' এই বলে উনি পকেট থেকে একটশ ছোটো টেপ-রেকর্ডার বের করে চালু করে দিলেন। উদ্দেশ্য, প্রফেসরের স্বীকারোক্তি ধরে রাখা।

প্রফেসর বললেন, 'বলছি। তার আগে আমার দরকারি কথাগুলো সেরে নিই।'

গণেশ হালদার বলল, 'বলুন, আপনার দরকারি কথাগুলোই আগে শোনা যাক।'

প্রফেসর বললেন, 'আমার এক-নম্বর কথা, আমি প্রথম জীবনে সত্যিই প্রফেসর ছিলাম। রানাঘাটের কাছেই আছে নতুনগ্রাম কলেজ। সেখানে পড়াতাম। আমার আসল নাম কল্লোল বিশ্বাস। কলেজ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক কোপে পড়ে পঁচাত্তর সালে আমি চাকরি হারাই। খোঁজ নিলেই এটা জানতে পারবে। তারপর প্রতিশোধের স্পৃহায় আমি বেরাস্তায় নেমে পড়ি। নতুনগ্রামের কাছেই হিজুলি গ্রামে আমার এক বিধবা বোন থাকে। তার নাম রেখা। সে বড্ড দুঃখিনী। তার একটু খোঁজ নিয়ো।' একটু থেমে উনি ফের বললেন, 'আমার দু'নম্বর কথা, শুধু আমাকে ধরলেই দেশ থেকে চোরাচালান উঠে যাবে না। মনে রেখো, আমাদের মাথার ওপরেও মাথা আছে। দেশের রাঘব বোয়ালরা হচ্ছে সেই মাথা। তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়মিতভাবে বখরা খায়। পারো যদি, জনমত তৈরি করে তাদের উচ্ছেদ করো। আর তিন-নম্বর কথা হচ্ছে, এই জলটুঙিতে সরকারের মারফত একটা ট্যুরিস্ট লজ গড়ে তুলো।'

গণেশ হালদার বলল, 'চেষ্টা করব।'

নীলাম্বরবাবু শুধোলেন, 'কাল রাত্তিরে আপনি সাতজন লোকের মধ্যে

BanglaBook.org

চারজনকে খুন করেছেন?'

প্রফেসর বললেন, 'সাতজন কোথায় পেলে? চারজনই তো সেখানে ছিল। বাকিদের কথা জানিনে।'

গণেশ হালদার বলল, 'গতকাল রাজপাটে যে তিনজনের সঙ্গে আমাদের মারামারি হয়েছিল, তাদের তো এখন দেখলেন। তারা গত রাত্তিরে জলটুঙির একটা শাটার-ঘরে বন্দী হয়ে ছিল। তারা হয়তো আপনার খোঁজেই এখানে এসেছিল। তখন বলহরি কায়দা করে তাদের আটক করে।'

'তাই নাকি? আমি তো জানতাম না। জানলে তাদেরও শেষ করে দিতাম।' প্রফেসর বললেন।

নীলাম্বরবাবু বললেন, 'এখন বলুন, বলহরি তালুকদারকে যে-অস্ত্রটা দিয়ে খুন করেছেন, সেটা কোথায়?'

'সেটা এই জলার জলে।' বলেই প্রফেসর পেছন দিকে লাফ দিয়ে জলে পড়ে ডুব দিলেন।

অমনই জলার জলে ভীষণ আলোড়ন উঠল। নীলাম্বরবাবুও জলে লাফ দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গণেশ হালদার সময় মতন চেপে ধরে ওঁকে নিরস্ত করল। তারপর বলল, 'আমি গেল রাতেই দেখেছি পল্টন নামে একটা লোককে এই জলার জলে ফেলে দেওয়ার পর প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল। প্রফেসরের মতলবটা আমার আগে থেকেই আঁচ করা উচিত ছিল। নীলাম্বর, আমার এখন আফশোস হচ্ছে।'

জলার জলে প্রফেসরের দেহটা নিয়ে কয়েকটা জলজন্তুর মধ্যে তীব্র লড়াই শুরু হয়ে গেল। প্রফেসরের রক্তে লাল হয়ে গেল জলার জল।

পরে জানা গিয়েছিল এই জলায় মোট তিনটে কুমির আছে। জলটুঙিতে যারা খুন হত, তাদের দেহ এই কুমিরদের দিয়ে খাওয়ানো হত।

একটু বাদে খবর এল, নাগরাজ সদলবলে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

পরদিন গণেশ হালদার পিংকি-রিংকিকে দিল্লিতে একটা বোর্ডিং স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আগ্রহের সঙ্গে ওদের সব ভার নিতে চাইল। তবে এখনকার মতন ঠিক হল, ওরা জিৎদের সঙ্গে কলকাতায় আসবে, আর স্কুল না খোলা পর্যন্ত জিৎদের বাড়িতেই থাকবে।

জলটুঙির মামলা মিটে গেলে গণেশ হালদার রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিল জলটুঙিকে ট্যুরিস্ট লজ করে এই অঞ্চলে একটা ট্যুরিস্ট স্পট গড়ে তোলার। আনন্দের কথা, রাজ্য সরকার গণেশ হালদারের সুপারিশ মেনে নিতে দেরি করেনি।

—শেষ—

BanglaBook.org